Vol. 50 | No. 1 | 2012

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

শামসুর রাহমানের কবিতায় প্রেম ও নারী

Volume	50
Issue	1
Year	2012
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	নূরুন্নাহার ফয়জের নেছা
Published online	October 1, 2012
DOI	10.62328/sp.v50i1.1
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v50i1.1
Pages	৯-৩৯
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

শামসুর রাহমানের কবিতায় প্রেম ও নারী

Check for updates

নূরুন্নাহার ফয়জের নেছা

প্রেম, নারী ও সৌন্দর্য শামসুর রাহমানের কবিসত্তার মৌল প্রেরণা বলা চলে। তাঁর সৃষ্টির সিংহভাগ জুড়েই রয়েছে প্রেমের কবিতা। কবির মৃত্যুর পর অনুজপ্রতিম আরেক কবি শহীদ কাদরী (জ. ১৯৪২) মন্তব্য করেছিলেন, 'তিনি যদি রাজনীতি-সচেতন নাও হতেন, শুধু তাঁর প্রেমের কবিতাগুলোর জন্যেই স্মরণীয় থাকবেন।' (শহীদ, ২০০৬ : ৬৮) প্রকৃতপক্ষে শামসুর রাহমান তাঁর কবিজীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রেমের কবিতা রচনা করে গেছেন। সেসব কবিতা কখনো হংস বলাকার মতো ঝাঁকে ঝাঁকে এসে তাঁর কাব্যভূমিকে মুখর ও আনন্দবেগে উদ্বেল করে তুলেছে, আবার কখনো বিরূপ পরিপার্শ্বের চাপে প্রেমাবেগ প্রতিসরিত হয়েছে জনসংলগ্নতায়। তাই প্রেমের কবিতা তখন জন্মেছে কম। প্রেমাবেগ প্রকাশের প্রথম পর্যায়ে তরুণ কবি সলজ্জ, ভীরু, কিন্তু পরবর্তীকালে প্রৌঢ় কবি আবেগ প্রকাশে অকুণ্ঠ, উচ্চকণ্ঠ, এমন কি কখনো তা তীব্র আবেগে সংরক্ত। বুদ্ধদেব বসুর কঙ্কাবতী কিংবা জীবনানন্দ দাশের বনলতা সেন, শঙ্খমালা কিংবা বিষ্ণু দে-র লিলি, ডলু এমন কি লুই আরাগঁর এলসার মত কোনো নায়িকার সাক্ষাৎ শামসুর রাহমানের প্রেমের কবিতায় পাওয়া যায় না। যা থেকে বোঝা যায় কবিতায় কোনো বিশেষ নারীমূর্তি কিংবা নায়িকা তৈরি করতে তিনি ততটা উৎসাহী ছিলেন না। পক্ষান্তরে তাঁর কবিতায় একাধিক নারীর উপস্থিতি অনুভব করা যায়, যা কবির বাস্তব অভিজ্ঞতাজাতও হতে পারে, কিংবা হতে পারে পুরোটাই শিল্পসৃষ্টির লক্ষ্যে কল্পিত। প্রেমের ক্ষেত্রে শামসুর রাহমান শরীর কিংবা হৃদয় কোনোটারই আধিপত্যে বিশ্বাসী ছিলেন না, অর্থাৎ শরীরসর্বস্ব প্রেম কিংবা শরীরবিবর্জিত প্রেম কোনোটিই তাঁর প্রেমচেতনায় একক বসতি স্থাপন করে নি। এই দুয়ের সম্মিলনে প্রেমের পূর্ণতা আসে বলেই তিনি মনে করতেন। তাঁর কবিতার ভূভাগে যেসব নারীর পদচারণা লক্ষিত হয় তারা প্রত্যেকেই আধুনিক, নাগরিক ফ্ল্যাটে তাদের বাস, গৃহ ও আপন দেহের সজ্জায় সুরুচিশীল, শিল্প-সাহিত্য ও জ্ঞানগর্ভ আলোচনায় সপ্রতিভ অর্থাৎ তারা বিদুষী এবং শিল্পবোধসম্পন্ন, রেস্তোরাঁ ও পাঁচতারা হোটেলের লবিতেও তাদের কারো কারো সঙ্গে কবির সাক্ষাৎ ঘটে, কখনো বা দেখা হয় কোনো অভিজাত এলাকায় এলিট শ্রেণির নৈশ পার্টিতে। টেলিফোনে প্রেমালাপে বিশেষ পটু তারা। প্রেমের কোনো পরিণামের জন্যে তারা কাতর নন। এদের কারো কারো আবার স্বামী-পুত্র-কন্যা নিয়ে আপাত সুখী সংসার রয়েছে। প্রৌঢ় কবিকে বয়সের ব্যবধান অতিক্রম করেও কেউ কেউ তাঁকে গ্রহণ করেছেন অপরিসীম প্রেমে, জাগিয়েছেন তাঁর মধ্যে মৃত্যুঞ্জয়ী চেতনা। তবে শামসুর রাহমানের নারীরা শহরবাসী হলেও তাদের রূপমাধুরী বর্ণনায় প্রায় সর্বত্রই তিনি প্রকৃতিলগ্ন। সেই নারীদের অনিন্দ্যসুন্দর রূপরাশি প্রকৃতির নানা অনুষঙ্গেই কবি ফুটিয়ে

* সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

তুলেছেন। শামসুর রাহমানের প্রেমচেতনার আরেকটি লক্ষণীয় দিক হলো তাঁর কবিতায় প্রায়ই কবিতা ও প্রেমিকা এবং দেশ ও দয়িতা অভিন্ন রূপ পায়। জীবনের জন্যে ভালোবাসাকে কবি অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলে বিশ্বাস করতেন।

প্রেম সম্পর্কে শামসুর রাহমানের একান্ত ভাবনারাজির কিছু নিবিড় উচ্চারণ লক্ষ করা যায় তাঁর বিভিন্ন সময়ে দেয়া সাক্ষাৎকারে। সেসবের প্রাসঙ্গিক উৎকলনে উন্মোচিত হবে তাঁর মনোবিশ্বে প্রেম-উপলব্ধির স্বরূপ। প্রথমেই হুমায়ুন আজাদকে দেয়া তাঁর সাক্ষাৎকারটি নেয়া যাক, যেখানে তিনি বলেছেন —

> আমি দেহাতীত প্রেমে বিশ্বাস করি না। তবে শরীরটাই সব নয়। ...হৃদয়ের ব্যাপারটা দেহে থাকলেও এটা দেহের বাইরের একটা জিনিস। আমার মনে হয় সেটা আরো গভীর ব্যাপার। প্রেম শুধুমাত্র শরীর-নির্ভর নয় এবং শুধুমাত্র হৃদয়-নির্ভরও নয়। দুটির মিশ্রণে প্রেমের জন্ম বলে আমি মনে করি। (হুমায়ুন, ১৯৯১ : ১২৭)

অপর এক সাক্ষাৎকারে তিনি ভালোবাসা বিষয়ে অন্যতর একটি ব্যাখ্যা দিয়েছেন —

> ভালোবাসা ছাড়া তো মানুষ থাকতেই পারে না। সে নারীর প্রতিই হোক বা শিশুর প্রতিই হোক বা বৃক্ষের প্রতি হোক। ভালোবাসার কোনো বাঁধাধরা নিয়ম নেই। এটা দায়িত্বই এক ধরনের। (আনিসুজ্জামান, ২০০৬ : ১৯৮)

এখানে ভালোবাসার নির্বিশেষত্ব এবং তার সঙ্গে দায়িত্ববোধের বিষয়টি এসেছে, যা থেকে প্রেমের ঊর্ধ্বায়নের দিকটিই আভাসিত এবং যে প্রেমচেতনা তাঁকে স্বদেশ ও মানবতার প্রতি দায়বদ্ধ এক কবিব্যক্তিত্বে পরিণত করে তুলেছিল, তার বীজটি উক্ত চিন্তার মধ্যেই উপ্ত রয়েছে। একই সাক্ষাৎকারে তিনি ব্যক্তিগত জীবনে একাধিক নারীকে ভালোবাসার কথা স্বীকার করেছেন।

নিজের লেখা "প্রেম ও কবিতা" শীর্ষক একটি রচনায়ও তাঁর প্রেম সংক্রান্ত ভাবনার পরিচয় মেলে —

> প্রেমে আমি একনিষ্ঠ হতে পারি নি সত্য, কিন্তু আমার প্রেমে, এ কথা আমি জোর দিয়ে বলবো, কোনোদিন খাদ ছিল না, আজো নেই। আমি কখনো আমার কোনো প্রেমিকার অসম্মান করি নি। কেউ কেউ প্রশ্ন করতে পারেন, 'এই বয়সে লোকটা এতো ভালোবাসতে পারে কী করে? কী করে প্রায় নিজের কন্যার সমবয়সী তরুণীর প্রেমে পড়তে পারে?' বিংশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি ডব্লিউ. বি. ইয়েটস মড গন ও তার কন্যা উভয়ের প্রেমেই পড়েছেন। ইয়েটসের বুড়ো হাড়েও জ্বলেছে প্রেমের বর্ণিল দেয়ালি। বার্ধক্যে রবীন্দ্রনাথ কারো প্রেমে পড়েছিলেন কি না জানি না, জানার উপায়ও নেই; তবে তিনি বেশি বয়সে উৎকৃষ্ট প্রেমের কবিতা এবং ভালোবাসার গান লিখেছেন।
>
> কেউ প্রেমে না পড়ে কি কখনো প্রেমের কবিতা লিখতে পারে? প্রেমে ব্যর্থ হয়ে একজন কবি ভালো প্রেমের কবিতা লিখতে পারেন; কিন্তু যার মধ্যে প্রেমানুভূতি নেই, তিনি কী করে প্রেমের কবিতা লিখবেন? প্রেম যার মনের কপাটে এসে কখনো কড়া নাড়ে নি তার পক্ষে আর যা-ই হোক প্রেমের কবিতা লেখা সম্ভব হবে না। তিনি যদি লেখেনও তবে সেটি হবে খুবই কৃত্রিম, বানানো রচনা। (শামসুর, ২০০৫ : ৮০৬)

উল্লিখিত অংশে শামসুর রাহমানের প্রেমভাবনার বেশ কয়েকটি দিক উন্মোচিত হয়েছে। প্রথমত, তাঁর মতে জীবনে একাধিকবার প্রেম আসতে পারে। প্রতিটি প্রেম এবং প্রেমাস্পদার রয়েছে স্বতন্ত্র তাৎপর্য। এমন কি নারী-পুরুষের সম্পর্কের ক্ষেত্রে আমাদের সমাজে যে অনুশাসনের বেড়া আছে তা-ও তিনি ভেঙে দিচ্ছেন এবং অবলীলায় কন্যার বয়সী তরুণীর সঙ্গে প্রণয়ের সম্পর্ক তৈরি করছেন। সেক্ষেত্রে পশ্চিমা কবির উদাহরণ টানছেন তিনি। অর্থাৎ প্রেমের পথে বয়সকে তিনি বাধা হিসেবে মানছেন না। একজন পুরুষের যে-কোনো বয়সে যে-কোনো বয়সী নারীর সঙ্গে প্রেম হতে পারে। এক্ষেত্রে তাঁর কাছে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে ব্যক্তির প্রেমানুভূতি। কবি আরো বিশ্বাস করেন যে, প্রেমে পড়া ছাড়া উৎকৃষ্ট প্রেমের কবিতা লেখা যায় না। অর্থাৎ তিনি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ওপর জোর দিচ্ছেন সর্বাধিক। তাঁর কবিতায় আমরা এসব ভাবনার প্রতিফলন প্রত্যক্ষ করব। তবে এই মূল্যায়নে প্রবেশ করার পূর্বে বাংলা কবিতার ঐতিহ্যের ধারায় প্রেম-ভাবনার রূপ রূপান্তরের একটি সংক্ষিপ্ত পরিপ্রেক্ষিত অবলোকন করা যেতে পারে। একই সঙ্গে কবির সমসময়ের ও পূর্বসূরিদের প্রেমের কবিতার তথা তাঁদের প্রেমবোধের একটি তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে শামসুর রাহমানের প্রেম ও নারীভাবনার স্বরূপ উদঘাটনের চেষ্টাও করা যায়।

পৃথিবীর তাবৎ শিল্প-সাহিত্যের চিরন্তন ও সীমিত গুটিকয়েক বিষয়ের মধ্যে প্রেম অন্যতম। সমালোচকের দৃষ্টিতে —

> প্রেমের অভিব্যক্তি নেই এমন কোনো শিল্পরূপ নেই। প্রেমোপলব্ধির বিস্ময়, হর্ষ, উন্মাদনা, ব্যাকুলতা, তার মিলন, বিরহ, তার সম্ভোগ, তার বিক্ষোভ, প্রেমিকের অভিমান, অভিসার, সঙ্কোচ, শঙ্কা, প্রেমের আরো কত না সূক্ষ্ম বৈচিত্র্য কোনো না কোনো সজ্জায় সর্বদেশের সাহিত্যেই প্রকাশিত হয়েছে। প্রেমের জাতিভেদ নেই, দেশভেদ নেই, প্রেম কালসীমিত নয়। (অমলেন্দু, ২০০৮ : ২৯১)

কবি-সাহিত্যিক-শিল্পী ভিন্ন হতে পারেন, প্রেমের পাত্র-পাত্রী ভিন্ন হতে পারে, তাদের আচার-আচরণ-অভিরুচি স্ব স্ব দেশ-কাল-সমাজ-উত্থিত হতে পারে, কিন্তু প্রেমের বোধের ক্ষেত্রে তারা সমতুল।

বাংলা কবিতার প্রায় সহস্র বর্ষের ঐতিহ্য অনুসন্ধানে প্রেমের কবিতার একটি উজ্জ্বল উপস্থিতি লক্ষণীয়। তবে বিবেচনার বিষয় হচ্ছে সেখানে প্রেম উপস্থাপিত হয়েছে কোন প্রক্রিয়ায়। অর্থাৎ প্রেমকাব্য রচনা করতে গিয়ে কবিরা কতখানি স্বাধীনতা পেয়েছেন বা বাধাগ্রস্ত হয়েছেন, অথবা সাধারণ মানব-মানবীর প্রেম সেখানে রূপায়িত হয়েছে কি না কিংবা প্রেমের দেহকেন্দ্রিক বা দেহাতিরিক্ত কোন রূপটি এসেছে ইত্যাদি বিষয়গুলো।

প্রাচীন ও মধ্যযুগের সামাজিক-রাজনৈতিক ইতিহাস থেকে ধারণা করা যায় যে, বাঙালি-জীবনে প্রেমের হাওয়া অনুকূলেই বহমান ছিল। অন্তত কালের খরস্রোত অতিক্রম করে লোকসাহিত্যের যেটুকু আমাদের কাল পর্যন্ত এসে পৌঁছেছে, তাতে এ-ধারণা করা অসংগত নয়। বিভিন্ন পালাগান, গীত, গাথার মাধ্যমে নারী-পুরুষের যে প্রণয়-কাহিনী বাংলা লোকসাহিত্যের ধারাটিকে সমুজ্জ্বল করে রেখেছে, সেখান থেকে বোঝা যায় যে এর প্রায় সবই সাধারণ মানব-মানবীর প্রেম এবং তা দেহ-সমুত্থ হলেও দেহ-সর্বস্ব ছিল না।

"স্নিগ্ধ, নম্র, অনুগ্র সে-প্রেম বাংলার গ্রামীণ জীবনের পরিবেশের সঙ্গে একান্তে মিশ্রিত, যে-পরিবেশ এক হিসাবে বড়ই অবিচিত্র অথচ বাঙালীর পক্ষে তার আকর্ষণ ও নবত্ব নিরবশেষ, সে-প্রেম ঘর বাঁধার অভিলাষী, ঘর ভাঙে না; সে-প্রেম বিরহ, ব্যর্থতা, বিনাশ নিয়ে আসতে পারে কিন্তু আত্মায় জ্বালা ধরায় না। এ-প্রেমের আভাস পাওয়া যায় মৈমনসিংহ-গীতিকায়, কোনো কোনো মঙ্গলকাব্যে, ঠাকুরমা ঠাকুরদার গল্পে।" (অমলেন্দু, ২০০৮ : ২৯১)

লোকসাহিত্যের বাইরে প্রথমেই আদিমধ্যযুগের বড়ু চণ্ডীদাসের *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য*-এর কথা উল্লেখ করা যায় যেখানে রাধা-কৃষ্ণের প্রেমকথা রয়েছে। পরবর্তীকালে চৈতন্যদেবের প্রভাবে বাংলা সাহিত্যে রাধা-কৃষ্ণের প্রেমকে বিষয় করে বৈষ্ণব পদাবলী রচনার সুদীর্ঘকালব্যাপী যে ঐতিহ্য প্রচলিত হয় তার সঙ্গে বড়ু চণ্ডীদাসের কাব্যের সুস্পষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান। বড়ুর কাব্যে মানব-মানবীর দেহ-সমুখ প্রেম প্রায় দেহসর্বস্ব হয়েও শেষাবধি ধর্মীয় আবরণে আচ্ছাদিত হয়। পক্ষান্তরে বৈষ্ণব পদকর্তাগণ অদ্বৈত-দর্শনের আধারে রাধা-কৃষ্ণকে রক্তমাংসের মানব-মানবীর পরিবর্তে জীবাত্মা-পরমাত্মার প্রতীক করে তোলেন। পার্থক্য যাই হোক, বড়ু অঙ্কিত রাধাই যে বাংলা কবিতার প্রথম নায়িকা সে-কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, এমন কি কালক্রমে রাধা-কৃষ্ণ বাঙালির প্রেমের আর্কিটাইপে পরিণত হয়েছে। এছাড়াও মধ্যযুগের বিভিন্ন মঙ্গলকাব্যেও প্রেমের চিত্র এসেছে, তবে তা ছিল মানুষের বেশে দেব-দেবীর প্রণয়লীলা, বলা যায় ইহলীলা। ব্যক্তিগত প্রেম বড়ুর কাব্যেও নয়, পদাবলীতেও নয়, মঙ্গলকাব্যধারায়ও নয় এমন কি মধ্যযুগের সর্বশেষ কবি ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর কাব্যেও পাওয়া যায় না। সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে তুলনা করলে বাংলা কবিতায় প্রেমকে উপেক্ষিত কিংবা কিছুটা এড়িয়ে চলতেই দেখা যায়। কেননা উনিশ শতকের প্রথমার্ধে প্রেমের কবিতা তো বিরলই ছিল এমন কি ঈশ্বরগুপ্ত ছাড়া কবিতাচর্চায় উৎসাহী কবি-ব্যক্তিত্বও চোখে পড়ে না। মধুসূদনের কাব্যেও ব্যক্তিগত প্রেম আশ্চর্যজনকভাবে অনুপস্থিত, অথচ বাংলা ভাষায় তিনিই প্রথম সনেট রচনা করেন। আমাদের অপেক্ষা করতে হয় বিহারীলাল চক্রবর্তী পর্যন্ত। তিনিই কাব্যে প্রেমকে মর্যাদার আসন দেন এবং রচনা করেন প্রেমের কাব্য।

> সে মর্যাদা আরো ঘনীভূত হল, মহত্তর হল, রবীন্দ্রনাথের কাব্যে। এ-ধারা প্রধানত ভাববিলাসী, সচরাচর দেহচেতনা ও জড়জাগতিক স্পর্শ বাঁচিয়ে চলে, যদিও রবীন্দ্রনাথের কাব্যে তীব্র আবেগশীল, দেহচেতন, অলজ্জ প্রেম আদৌ অনুপস্থিত নয়। এ-প্রেমবোধ বৈষ্ণব-কাব্যের মতো রূপকপরায়ণ বক্রার্থ-নির্ভর নয় বটে, এ-কাব্যের প্রিয় বা প্রিয়তমা মানুষ মানুষী বটে, মানুষের বেশে দেবদেবী নয়, কিন্তু তবুও এ-কাব্যে বাস্তব ও প্রত্যক্ষ তথ্য এড়িয়ে, প্রধানত প্রেমের ভাবরাজি নিয়ে, ব্যস্ত থাকার নিরন্তর প্রয়াস লক্ষ্য করি। উচ্ছ্বাস ও আবেগের সূক্ষ্মতা, তীব্রতা, নিবিড়তা, প্রাবল্য, সবই পাওয়া যায় প্রেমকাব্যের এই ধারায়, অনুভূতির এত সুকুমার শিল্পরূপ অন্য প্রেমকাব্যে বিরল বটে, তবুও বলতে হয় যে এ-কাব্যের প্রেমে অবয়বতার অভাব। এ-প্রেমাবেগ উচ্ছ্রিত হচ্ছে শরীরী প্রিয় বা প্রিয়ার জন্য নয়, ভাবলোকবাসী প্রেমের জন্য, মানসসুন্দরীর জন্য। এ-নিরবয়ব প্রেম কয়েক দশকের জন্য বাঙলা কাব্যের প্রধান প্রেমবস্তু হয়ে উঠল, পূর্ববঙ্গীয় কবি গোবিন্দদাসের প্রত্যক্ষ অবয়বী প্রেম কোনোরকম প্রতিযোগিতা করতে পারল না এর সঙ্গে, হয়তো যেহেতু রবীন্দ্রনাথের তুলনায় তাঁর করণকৌশল, তাঁর ভাষা রীতিমতো অপকৃষ্ট অথবা যেহেতু তাঁর সাবয়ব প্রেমে তৎকালীন সাহিত্যিক রুচি সন্তুষ্ট হয় নি। (অমলেন্দু, ২০০৮ : ২৯২-২৯৫)

উদ্ধৃতাংশের সঙ্গে আমাদের বক্তব্যের তেমন কোনো বিরোধ নেই, তবে রবীন্দ্রনাথের *মহুয়া* ও *পূরবী* কাব্যগ্রন্থদুটি যে কোনো আদর্শলোকের বা ভাবলোকের নারীকে নিয়ে রচিত নয় বরং প্রেমিক-প্রেমিকার মানুষী রূপ ও আবেগই যে সেখানে মুখ্য হয়ে আছে, সেদিকটি স্মরণ রাখা বাঞ্ছনীয়। কিন্তু তারপরেও নানাদিক থেকে তিরিশের কবিতায় প্রেমের রূপায়ণে আমরা পাই ভিন্ন স্বাদ ও বৈচিত্র্য। বিশ্বযুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে মানবিক বিপর্যয়, মূল্যবোধের অবক্ষয়, বিজ্ঞানের নানাবিধ আবিষ্কার, বিশেষত ফ্রয়েডের মনোবিকলনের বৈপ্লবিক ধারণা কবিদের প্রেমভাবনার ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন সাধন করে। সমালোচকের মতেও তার সমর্থন মেলে —

> তিরিশের দশকে প্রেমে নিমগ্নতার পরিবর্তে এলো নিরাসক্তি, ভোগের পরিবর্তে ঈষৎ নিস্পৃহতা, রোমান্টিক অনির্দেশ্যতার পরিবর্তে প্রাত্যহিকতা, সংযুক্তির পরিবর্তে বিবিক্তির বোধ, চিরন্তনতার পরিবর্তে ক্ষণিকতা, রূপতৃষ্ণার পরিবর্তে বিস্ময়হীনতা। তবে এসব সত্ত্বেও দেহচেতনা অবসিত হয়ে যায় নি। কিন্তু দেহ ভোগলিপ্সায় তৃপ্ত নয়, কেননা মনোবিকলন তত্ত্বের কবিরা পার্থিব কিংবা অপার্থিব নানা অনুষঙ্গে প্রেমকে আস্বাদন করতে চেয়েছেন : বুদ্ধদেব বসু যেখানে দৈনন্দিন জীবনযাপনের মধ্যে প্রেমের স্পর্শ পেতে চান প্রেমিকার সান্নিধ্যে, সুধীন্দ্রনাথের সেখানে সাক্ষাৎ হয় 'অশ্লেষার রাক্ষসী বেলায়'। এই যুগপ্রভাবেই জীবনানন্দ প্রেমিকাকে নিসর্গে আরোপ করে শীতল হতে চান। কিন্তু বিষ্ণু দে প্রথম উপলব্ধি করলেন বিপ্লবের প্রেরণা। বহিঃপৃথিবীতে যখন স্বার্থের সংঘাত প্রেমিকা তখন সংগতির সূত্র। প্রেমাস্পদের আকর্ষণে তাই বন্ধন নয় সাম্যবাদী সমাজের ইশারা, প্রেম ও সংগ্রাম একীভূত হয়। অন্যদিকে জীবনানন্দ দেশকাল, ইতিহাস-সভ্যতা-পৃথিবীর পটে প্রেমকে উপস্থাপিত করে তাতে লক্ষ করেছেন মানবিকতার বিস্তৃতি। বস্তুত এভাবেই বিভাগপূর্ব বাংলা কবিতার আধুনিক পর্বে প্রেমের উর্ধ্বায়ণ ঘটেছে। (মাসুদুজ্জামান, ১৯৯৩ : ৩৫)

তিরিশি কবিতার ঐতিহ্যে প্রাণিত কবি শামসুর রাহমান প্রেমের কবিতা রচনায় পূর্বসূরিদের অনুসরণ করলেও এক্ষেত্রে আমরা তাঁর স্বকীয়তার স্বাক্ষর দেখব। অন্যদিকে ষাটের দশকের কবিদের হাতে প্রেমের কবিতা যেভাবে বিশিষ্টতা পেয়েছে, সেখানেও তিনি সতর্ক ব্যতিক্রম। প্রসঙ্গত, ষাটের দশকের বাংলাদেশের কবিতায় প্রেম ও নারীর যে রূপায়ণ আমরা প্রত্যক্ষ করি তার একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরা যাক —

> প্রেম ও নারী ষাটের কবিতায় এক নবতর অভিজ্ঞতার সূচক হয়ে উঠেছে। ষাটের কবিতায় প্রথাগত প্রেম উপেক্ষিত; মদ, জুয়া, সম্ভোগ ও স্বেচ্ছাচারী মানসিকতায় ক্লীবত্বপ্রাপ্ত ষাটের প্রেম — Death is our darling, but those bloody ladies who loitering before our eyes সত্তারহিত, দেহসর্বস্ব এই রতিপ্রেমে বোদলেয়ারকৃত নিমজ্জনই একমাত্র প্রভাবক নয় ; বরং অস্থিতিশীল ক্রমকম্পমান অস্তিত্বের জন্যই ষাটের কবিতায় প্রেম পায় নি মুহূর্তের স্থিরতা। সুতরাং ষাটের কবিদের কাছে নারী মাত্রই দেহজ কামনাবাসনার আধার, লৈঙ্গিক স্পৃহার মাধ্যম। ত্রিশোত্তর কবি নারীর শরীরের অভ্যন্তরে কুৎসিত কঙ্কালকে প্রত্যক্ষ করে লিখেছেন —
>
> নতুন ননীর মতো তনু তব? জানি, তার ভিত্তিমূলে রহিয়াছে কুৎসিত কঙ্কাল —
> (ওগো কঙ্কাবতী)
> মৃত-পীত বর্ণ তার : খড়ির মতন শাদা শুষ্ক অস্থি শ্রেণী —

> আর ষাটের কবিতায় নারীর উপস্থিতি কবিদের রিরংসাসঞ্জাত প্রেমের মধ্যে প্রাপণীয়। নারী সেখানে প্রায়শঃই আসবাবসদৃশ বহুব্যবহৃত 'মেয়েমানুষ'। কবিদের রিরংসার আত্মপরিক্রমা এই নারীকে কেন্দ্র করেই। পঞ্চাশের কবিদের কাছে নারী যেখানে পেয়েছে সৃষ্টিশীলা, ফলবন্তা প্রমূর্তি, ষাটের কবিদের কাছে নারী শয্যাসঙ্গিনী। আর ষাটের কবিরা নারীকে গ্রহণ করেছেন গণিকারূপে। গণিকাদেহে রিরংসা ও বলাৎকারে তারা নিমজ্জিত হয়ে শুদ্ধ হতে চেয়েছেন। (বায়তুল্লাহ, ২০০৯ : ১১৭)

উদ্ধৃতাংশে পঞ্চাশের কবিদের প্রেম ও নারীর রূপায়ণের বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত হয়েছে। শামসুর রাহমান দয়িতাদেহের অনুপুঙ্খ বর্ণনা করেছেন, বর্ণনা করেছেন দয়িতার সঙ্গে মিলনের মদির মুহূর্ত কিন্তু কোথাও নারী শুধু ভোগের সামগ্রী, এমন অভিব্যক্তি ব্যক্ত হয় নি। বরং ভালোবাসার নারীদের প্রতি তাঁর এক ধরনের সকৃতজ্ঞ মুগ্ধতা প্রকাশ পেয়েছে, বৃদ্ধ বয়সেও প্রেমের স্পর্শে তিনি গেয়েছেন উজ্জীবনী গান।

শামসুর রাহমানের প্রথম কাব্যগ্রন্থ *প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে* (১৯৬০)-তে প্রেমের কবিতা অজস্র নয়, তবুও এ-কাব্যে আমরা পাই তাঁর প্রেমের স্মৃতি, হারানো প্রেমিকার জন্যে বেদনাবোধ। অন্যদিকে আছে পূর্বরাগ, অনুরাগ, দয়িতা আবিষ্কারের উচ্ছ্বাস ইত্যাদি প্রণয়ের বিচিত্র অনুভবপুঞ্জ। এ-কাব্যে তাঁর দয়িতা স্পষ্ট কায়া ও রূপ নিয়ে উপস্থিত নয়, আমরা কবির অনুভবে তার ছায়া দেখি।

'জর্নাল, শ্রাবণ' কবিতার তিনটি অংশ জুড়ে আছে হারানো প্রেমিকার জন্যে বেদনাবোধ, সেই প্রেমিকার হাতের স্পর্শ, কপালের টিপ, কণ্ঠের মৃদু গুণগুণ ধ্বনি, হাসি, কালো চুল আর অতল চোখের দুটি শিখা। সেই দুটি চোখ যে আলো দিতে পারে তত আলো অন্য কোনো জ্ঞানের প্রদীপও দিতে পারে না বলে তাঁর বিশ্বাস। কবিতার শেষাংশে আছে সেই বিরহিনীর কথা, কোনো প্রণয়ীর কথা ভেবে তার প্রহর কাটে, কার কোলে মাথা রেখেই বা সে বিদায় নেবে এই পৃথিবী থেকে ইত্যাদি খেয়ালী ভাবনা। 'পূর্বরাগ' দয়িতা আবিষ্কারের উচ্ছ্বাসে উদ্বেল একটি কবিতা। পরবর্তী 'তোমাকেই বলি' অনুরাগের কবিতা এবং ভীরু প্রেমিকের দ্বিধাকম্পিত হৃদয়ের কথা, যার মনের কথাটি মনেই থেকে যায়, শত চেষ্টায়ও প্রেমিকাকে হয় না বলা। 'কোনো একজনের জন্যে' কবিতাটিও অনুরাগের এবং প্রথম প্রেমের আগমনে প্রেমিক হৃদয়ের যে বাঁধভাঙা উচ্ছ্বাস সেই আবেগে মথিত। জীবনানন্দের 'বনলতা সেন'-এর হালভাঙা নাবিকের ছায়া দেখি আমরা এই প্রেমিকের মধ্যে যখন সে বলে, এতকাল ছিল সে একা, ব্যথাদীর্ণ, গানহীন, প্রাণে ছিল না সতেজতা, ছিল না হৃদয়ে কোনো স্বপ্ন, উন্মথিত সময়ের আকাশ চিরে ওড়ার মতো ডানা ছিল না এবং সাহসও ছিল না; শুধু অনিশ্চয়তা আর মৃত্যুপ্রতিম স্মৃতির সরীসৃপ নিয়ে সে যখন বিব্রত ও বিপজ্জনক অবস্থায় পতিত, ঠিক সেসময় তার নাস্তিক জীবনে আস্তিক্যের বার্তা হয়ে, অনন্তের এক বিন্দু আলো হয়ে, বাহুতে উজ্জীবনের শিখা হয়ে এবং তাবৎ নিমজ্জন থেকে উদ্ধারের মন্ত্রণা হয়ে এল পরম কাঙ্ক্ষিতা প্রণয়িণী। তার আগমনে সবকিছুই হয়ে ওঠে সুন্দর, মধুর, অনন্য।

কে জানত এই খেয়ালি পতঙ্গ, শীতের ভোর,
হাওয়ায় মর্মরিত গাছ,
ঘাসে-ঢাকা জমি, ছায়া-মাখা-শালিক
প্রিয় গানের কলি হয়ে গুঞ্জরিত হবে
ধমনিতে, পেখম মেলবে নানা রঙের মুহূর্ত।
কে জানত লেখার টেবিলে রাখা বাসি রুটি
আর ফলের শুকনো খোসাগুলো
তাকাবে আমার দিকে অপলক
আত্মীয়ের মতো?
('কোনো একজনের জন্যে', *প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে*)

'যে ছায়া আয়নায়' কবিতায় প্রেমিকাকে নয় প্রেমকেই বড় করে তুলেছেন কবি। বুদ্ধদেব বসু যেমন প্রেয়সীর নতুন ননীর মতো তনুর ভিত্তিমূলে কুৎসিত কঙ্কাল দেখেছিলেন, দেখেছিলেন তার রূপ-মাধুরীর ক্ষণিকতা, জেনেছিলেন দয়িতার লজ্জা-শঙ্কা-শিহরন-সাজ সবই অর্থহীন এবং প্রেমিকার চেয়ে নিজের প্রেমকেই বড় করে দেখেছেন, তেমনি শামসুর রাহমানকেও দেখি দয়িতার উদ্দেশে বলছেন যে, আয়নায় যে-ছায়া সকাল-সন্ধ্যা দেখছে তাঁর প্রেমিকা, তাকে কেউ অনুপমা বলবে না, কিংবদন্তির নায়িকা হেলেন-তুল্য রূপের খ্যাতিও তার নেই যে তার জন্যে কোনো নগরী পুড়ে ছাই হবে। তবুও তার প্রতি কবির যে ভালোবাসা এবং প্রতিদিনের সংসারে তাকেই যে পেতে চান সেই বিষয়টিকে তিনি বড় করে দেখছেন। দুটি কবিতার অংশবিশেষ —

১। সব আমি জানি, তবু–তাই ভালোবাসি,
জানি ব'লে আরো বেশি ভালোবাসি।
জানি, শুধু ততদিন তুমি র'বে তুমি,
যতদিন রবে মোর প্রিয়া। ('প্রেমিক', *বন্দীর বন্দনা*)

২। আক্ষেপ প্রচ্ছন্ন থাক, ক্ষমা করো এ সত্যভাষণ।
জেনেছি স্তুতির জাদু, কী দরকার মিথ্যাচারে মজে?
যা-কিছু অর্পিত এই কবিতার সামান্য আধারে,
নিশ্চিত এ নয় জানি প্রেমিকের উচ্ছ্বাস প্রপাত,
... ...
অলোকসামান্য নয় লেখনী আমার, তুমি তাই
পারবে না কখনো এড়িয়ে যেতে কালের তিমির।
তাতে কী? অন্তত ছিলে আমার নিভৃত অন্তর্লোকে
গানের মতোই ব্যাপ্ত চিরদিন : সে-ও তুচ্ছ নয়।
('যে ছায়া আয়নায়', *প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে*)

উদ্ধৃতাংশে প্রেম সম্পর্কে রোমান্টিক ভাবোচ্ছ্বাস কিংবা প্রেমিকার অধরা মূর্তি বিনির্মাণে আধুনিক কবির অনীহা ব্যক্ত হয়েছে, এমন কি প্রেমিকার যাবতীয় অভিব্যক্তির অর্থহীনতা জেনেই তাঁরা ভালোবাসছেন। অর্থাৎ পূর্বের কাব্যধারায় প্রেম সম্পর্কে যে মোহমুগ্ধতা ছিল তাকে বাস্তব জীবনে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে গ্রহণ করছেন তাঁরা এবং প্রেমিকার বরতনুর

অন্তরালে রয়েছে কুৎসিত কঙ্কাল, অন্তর্নিহিত এই সত্যের স্বরূপ জানার ট্র্যাজেডি মেনে নিয়েই তাঁরা জীবনে ও কাব্যে প্রেম কামনা করেছেন।

'একান্ত গোলাপ'-এ ব্যক্ত হয়েছে তাঁর নাস্তিকতা এবং তাঁর প্রেম প্রথাসিদ্ধ পথের বাইরে, এমনই একটি প্রত্যয়দীপ্ত প্রতিশ্রুতি, যদিও সমালোচকের দৃষ্টিতে কবি সেই প্রমাণ এই কাব্যে রাখতে পারেন নি। এই কবিতায় তিনি দয়িতাকে তাঁর কামনার ফুলে মঞ্জরিত হতে বলেছেন। অর্থাৎ দয়িতা হৃদয়ের সঙ্গে সঙ্গে দয়িতাদেহও তাঁর কাম্য হয়ে উঠেছে। 'ব্যবধান', 'রজনীগন্ধার ঘ্রাণ' কবিতা দুটিতে আছে হারানো প্রেমের স্মৃতি-রোমন্থন।

রৌদ্র করোটিতে (১৯৬৩) প্রেমের কবিতা বিরল। 'রূপান্তর' শীর্ষক কবিতায় কবি উপস্থাপন করেন তারুণ্যের চাঞ্চল্যে এবং প্রাণের সজীবতায় উজ্জ্বল এক তন্বী-কে, যাকে ঘিরে ব্যক্ত হয়েছে তাঁর মুগ্ধতা এবং গোপন কামনা। এ-তরুণী তাঁর কল্পনাসৃষ্ট নয় বরং কবিতায় যেভাবে তাকে উপস্থাপন করা হয়েছে তাতে ধারণা করা যায় কবি তার প্রতিটি পদক্ষেপ নিবিড়ভাবে দেখেছেন এবং বহুদিন ধরেই। তার হাঁটা-চলা, সাজ-সজ্জা, হাতে বই, বুকের ওপর কালো বেণী এমন কি তার চিবুকের ঘামের ফোঁটা কোনোটিই কবির দৃষ্টি এড়ায় না। সে বাগানে ফুল তোলে, ঝকঝকে দাঁতে সবুজ পেয়ারা কামড়ে ধরে, পোষা ময়নাকে ছাতু খেতে দেয়, ভাঁড়ারের অন্ধকার কোণে আরশোলা দেখে আঁৎকে ওঠে, তারুণ্যের স্বভাবসুলভ অবহেলায় পানি চেয়ে গ্লাস ভেঙে ফেলে, নখ খায়, আঙুলে চাবির রিং ঘোরায়, সুরের তাল কেটে গেলে খিলখিল হেসে ওঠে এবং ক্যারম খেলতে গিয়ে খেলাটাই মাটি করে—তারুণ্যের এ-চপলতা কবির অন্তরে সঞ্চার করে একরাশ ভালোলাগা। মেয়েটি কবিতাবোদ্ধা নয়, পড়েও না, তবুও তিনি শুধু তার সৌন্দর্যরাশি দেখে চোখের তৃষ্ণা মেটান। তাকে তিনি জীবনে পাবেন না, এ বাস্তবতাও তিনি জানেন অথচ তাকে পাবার নাছোড় বাসনাও দূরীভূত হয় না। কল্পনাতেই চলে কবির এই প্রেমচর্চা, যা তাঁকে বেদনার্ত করে, কেবলই বিদ্ধ করে যন্ত্রণার কাঁটায় —

> হয়তো পারতে হতে সোনালি-নিবিড় বালুকণা
> আমার মুঠোয় ঝলোমলো, ভাবি তুমি অর্গানের
> ধ্বনির মতোই শ্রাবণের কালো ফোঁটা পাতাবাহারের বুকে,
> বাগানের টসটসে ফলের সুরভি, মাংসে-বেঁধা
> গোলাপের কাঁটা ... (রূপান্তর, *রৌদ্র করোটিতে*)

লক্ষণীয় যে, উল্লিখিত স্তবকে কবি তাঁর ভালোলাগা তরুণীকে যে যে উপায়ে পেতে চেয়েছেন তার সবকটিই ক্ষণস্থায়ী। হাতের মুঠোয় বালুকণা ধরে রাখা যায় না, পাতাবাহারের বুকে পানির ফোঁটাও থাকে ক্ষণকাল, ফলের সুরভি ইত্যাদি কোনোটিই ধরে রাখা যায় না। তাদের সৌন্দর্য মুগ্ধ করে ঠিকই কিন্তু তা অপ্রাপণীয়ই থেকে যায়। না-পাওয়ার এই মধুর বেদনা তাই কবিকে মাংসে-বেঁধা গোলাপের কাঁটার মতই বিদ্ধ করে নিরন্তর।

পরবর্তী গ্রন্থ *বিধ্বস্ত নীলিমা* (১৯৬৭)-তেও প্রেমের কবিতার প্রাচুর্য নেই। মূলত সেই সময়কার অর্থাৎ ষাটের দশকের মাঝামাঝি থেকে স্বদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি এতটাই

উত্তাল ছিল যে, কবির পক্ষে হৃদয়ের একান্ত অনুভতিগুলোকে আংটির মতো ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখার অবকাশ ছিল না। আলোচ্য কাব্যের উৎসর্গপত্রে কবির সেই মানসিক অস্থিরতা প্রকট হয়ে আছে। — "ভীষণ অস্থির আমি, সম্প্রতি ক্ষমায় অপারগ। সদর রাস্তাকে ভয়, ঘোরালো সিঁড়িকে ভয় — কী যে এই রোগ। আমার জীবন যেন সীমাহীন অরণ্যে রোদন।...পাই না প্রতীতি কিছুতেই; চতুষ্পার্শ্বে সবকিছু যাচ্ছে ধ্ব'সে।..আজীবন যে নীলিমা ভালোবাসো তা-ও অবিরত সর্বত্র পড়েছে খসে ভয়ানক দ্রুত চাপ চাপ রক্তের মতো।" মানসিক এই অস্থিরতার তটে প্রেমের ঢেউ আছড়ে পড়বে না, এটাই স্বাভাবিক। তবুও একটি কি দুটি প্রেমের কবিতা যে উঁকি দেয় নি এমন নয়। 'মিশ্ররাগ' সেই বিরল কিছু কবিতার মধ্যে একটি। কবির ব্যর্থপ্রেমের স্মৃতি এখানে শুধু বিষাদ জাগিয়ে ক্ষান্ত নয় বরং প্রেমিকার দেহকামনায় তাঁর হৃদয় দারুণভাবে তৃষিত। এই কবিতার প্রেমিক গৌরাঙ্গীর দেহের বাগানে পরিব্রাজক, পূর্বের চেয়ে একটু খোলামেলাভাবে দয়িতাদেহের বর্ণনা চকিতেই বুঝিয়ে দেয় এই প্রেমিক শুধু হৃদয় নিয়ে তৃপ্ত নন আর এবং বিগত প্রেমিকার রূপ-মাধুরী কিংবা তার সঙ্গে কাটানো দু-একটি টুকরো স্মৃতি রোমন্থন করে তুষ্ট নন। বর্তমানে তাঁর দগ্ধ হৃদয়ে হাজার যুগের প্রেমিকের বাসনা বাসা বেঁধেছে এবং এ-অবস্থায় তাঁর রক্তের প্রতি কণা দয়িতার কাছে কামনা করে মহাদান। তবে সে মিলন আপাতত সম্ভব বলে মনে হয় না, তাই এত জ্বালা এবং মনে ভয় দৈবদয়ায় যদি কোনোদিন তাঁদের মিলন সম্ভবও হয়, ততদিনে কি তাঁর প্রেয়সীর যৌবন অটুট থাকবে?

এই কাব্যের 'ঘৃণায় নয়' কবিতাটিতে ব্যক্ত হয়েছে কবির প্রেমের ঊর্ধ্বায়ন। বিশ্বব্যাপী সৌন্দর্য, মহত্ত্ব, সত্য, সদগুণ তথা মানবিক গুণাবলির যে সামূহিক বিপর্যয় ঘটছে, তার বিপরীতে ঘৃণা নয় বরং প্রেমই মানুষকে বাঁচাবে বলে কবির দৃঢ় প্রত্যয়। 'আত্মজৈবনিক' কবিতায় আছে তাঁর ব্যর্থ প্রেমের কথা, যা আপাতত স্মরণের আঠা দিয়ে সত্তায় সেঁটে নিয়েছেন এবং বতিচেল্লির নারী কিংবা মাতিসের রমণীর মতো কাউকে না চেয়ে যে-হোক সে-হোক নারীকে নিয়েই জীবনের পথ পাড়ি দিতে চেয়েছেন। মধ্যবিত্তের জীবনে প্রেমের অচরিতার্থতার দিকটিই প্রকট হতে দেখা যায় এই কবিতায়।

নিরালোকে দিব্যরথ (১৯৬৮), *নিজ বাসভূমে* (১৯৭০), *বন্দী শিবির থেকে* (১৯৭২) কাব্যগ্রন্থগুলোর মধ্যে শেষোক্ত গ্রন্থটি প্রেমের কবিতাবর্জিত বলা যায়। *নিরালোকে দিব্যরথ*-এর 'একটি প্রস্থান, তার অনুষঙ্গ' কবিতাটিতে বিরহের অনুভূতি তীব্রভাবে এবং হৃদয়গ্রাহীরূপে এসেছে। এখানে তিনি দয়িতা-পরিত্যক্ত, বিচ্ছেদ-কাতর, নিঃসঙ্গ এক প্রেমিককে রূপায়িত করেছেন শীতার্ত নিষ্পত্র গাছের চিত্রকল্পে। দীর্ঘ এই কবিতাটিতে নায়িকা-বিচ্ছেদ-কাতর প্রেমিকের বেদনা প্রকাশ মধ্যযুগের নায়কের বিলাপ সদৃশ না হলেও পংক্তিপরম্পরায় তার শোক, আর্ত-আত্মার মর্মবেদনা প্রকট হয়ে আছে। নিষ্ঠুর দয়িতাকে কোনোভাবেই নিজের করে রাখতে না পারার বেদনা যেন এক অপূরণীয় শূন্যতার গহ্বর এবং ক্ষত সৃষ্টি করেছে তার অন্তরে। হুমায়ুন আজাদের মতে, এটি "শামসুর রাহমানের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রেমের কবিতা : বিচ্ছেদ স্মৃতি ও অমোচনীয় অভাব কবিতাটির পংক্তিপরম্পরায় উপমা-রূপক-চিত্রকল্প ও বিবৃতি ভর ক'রে ঘনীভূত হ'য়ে আছে। শোক

এখানে সীমাশূন্য, আবেগ অবাধ।" (হুমায়ুন, ২০০৪ : ১৩৯) শামসুর রাহমানের প্রেমিকাদের মধ্যে এই নারী নিষ্ঠুরা, প্রেমিকের আবেগের প্রতি সীমাহীন উদাসীন, অবলীলায় দু'দিনের প্রণয় সাঙ্গ করে ত্যাগ করে যায় অকপট প্রেমিককে। একই গ্রন্থভুক্ত 'প্রেমের কবিতা'-য় বিরূপ ও বিপন্ন বিশ্বের বিপরীতে কবি প্রেমকে প্রতিস্থাপন করেছেন।

নিজ বাসভূমে (১৯৭০) কাব্যগ্রন্থের 'ঐকান্তিক শ্রেণীহীনা' কবিতাটিতে আছে এক নারীর জীবন, যে বাঁচার সূত্র পেয়েছে কর্ম আর ধ্যানে। স্বাভাবিক জীবনের স্বচ্ছন্দ আয়েশের মোহ ত্যাগ করে এই নারী সদর রাস্তায় নেমে এসেছে । বেণী-নামা পিঠ তার ঘর্মাক্ত, নানা মনীষীর কথা ঝলসে ওঠে তার রুপালি স্বরে, সামান্যেই তার শিল্পিত বেশ, রুচির মোহন ছোঁওয়া জড়িয়ে রাখে তাকে সর্বক্ষণ। চকিতে জ্বলজ্বলে পদক্ষেপে মঞ্চে ওঠে, শিরদাঁড়া ঋজু হাতে পতাকা নিয়ে দৃঢ়তার সঙ্গে চলে যায় পল্টনের মাঠে, এভেন্যুর মোড়ে। কলেজের সংস্কৃত প্রাঙ্গণ, বস্তি, পথঘাট সর্বত্রই তার গমন। সামাজিক পশ্চাৎপদতাকে সহজেই অতিক্রম করে এগিয়ে যাওয়া এই নারী কবিকে বিস্ময়ে মুগ্ধ করে। এই নারীই আবার গৃহকোণে প্রবীণা মায়ের সেবায় নিষ্ঠ, পুরোনো কোনো গানের সুর গুনগুন করে, কখনো বা ভাইয়ের শার্টের গর্ত ভরে তোলে শিল্পকর্মের পটুতায়। তার জীবনেও রয়েছে ব্যক্তিগত প্রেম, কিন্তু সেই প্রেম-ই তাকে বহু জীবনের কল্লোলিত মোহনায় নিয়ে যায়। এই আবেগেই সে ছুটে যায় গ্রামে শহরে বিপদগ্রস্ত মানুষের কাছে, রিলিফ ক্যাম্পে। এই নারী শুধুই আবেগশাসিত নয়, বুদ্ধির শাণিত রৌদ্রও ঝলমল করে তার অস্তিত্বে।

প্রচুর গ্রন্থের পাকা রঙ
লাগে মনে, মননে সমৃদ্ধ তুমি ঐকান্তিক শ্রেণীহীনা;
সর্বোপরি বাস্তবের ঘনিষ্ঠ সংসর্গে
পেয়েছ বাঁচার সূত্র কর্ম আর ধ্যানে।
প্রথার কৃপণ মাপে সুন্দরী যে-জন
তুমি সে কখনো নও, অথচ তোমারও
নিজস্ব সৌন্দর্য আছে, যে-সৌন্দর্য ঝড়ের ঝাপটায়
সুতন্বী গাছের সাহসের,
যে-সৌন্দর্য মানবিক বোধের, প্রেমের, জীবনের।
('ঐকান্তিক শ্রেণীহীনা', *নিজ বাসভূমে*)

শামসুর রাহমানের কবিতায় চিত্রিত নারীদের মধ্যে উল্লিখিত নারী নিঃসন্দেহে ব্যতিক্রম। পরবর্তী সময়ে তাঁর কবিতায় বিদুষী নারীর সাক্ষাৎ মিলবে ঠিকই কিন্তু তারা ড্রইংরুমবাসী, কবির সঙ্গে একান্ত আলাপে কিংবা কখনো কখনো সাহিত্যিক আড্ডায় মুখর তারা। কিন্তু এই নারী তাঁর কামনা নয়, শ্রদ্ধামিশ্রিত বিস্ময় জাগায়। আবেগ ও বুদ্ধি এবং কর্ম ও ধ্যানের যৌথতায় যে জীবন গড়ে নিয়েছে এই নারী, প্রথাগত সৌন্দর্যের ঊর্ধ্বে তার ব্যক্তিত্বের নান্দনিক সৌন্দর্যকেই বড় করে দেখেছেন কবি, যেখানে মানবিক বোধ, প্রেম ও জীবনের ত্রিবেণীসংগম ঘটেছে। প্রকৃতপক্ষে এই ঐকান্তিক শ্রেণিহীনা শামসুর রাহমানের কাব্যসৃষ্টিতে উজ্জ্বল আবিষ্কার। তবে এটি যে বাস্তবরহিত কবিকল্পিত কোনো সৃষ্টি নয় একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। কেননা আমাদের রাজনৈতিক ইতিহাসের পটে নারীর এই রূপ দুর্লভ ছিল না।

এই গ্রন্থের 'ময়ূরগুলো', 'স্বর্গচ্যুতির পর' এবং 'দাঁত' প্রেমবিষয়ক কবিতা। প্রথমটিতে আছে কামনার চরম প্রকাশ, যা ইতঃপূর্বে শামসুর রাহমানের কবিতায় দেখা যায় নি। সমালোচকের বিশ্লেষণীদৃষ্টি কবির এই বিবর্তন-প্রক্রিয়াটি তুলে আনে এভাবে —

> প্রথমদিকে শামসুর রাহমান ছিলেন কিছুটা লাজুক; তেমন শরীরী লিপ্সায় তা চিহ্নিত নয়, বরঞ্চ ভীরু — প্রথার দৃষ্টিতে দেখা সে-প্রেমিকার শরীর, যৌবন আগুনের উজ্জ্বলতাও কেমন যেন দ্বিধাগ্রস্ত। কিন্তু ক্রমশই তাঁর দাঁত, নখ, জিহ্বা, ঘ্রাণেন্দ্রিয় শাণিত হয়ে ওঠে। শরীর যে কোনো ঘৃণার বস্তু নয়, আনন্দের উৎস; তৃপ্তি আর অস্তিত্বের ঝরনা — এটা শামসুর রাহমানের মতো নিঃসঙ্কোচে নিরলসভাবে আর কোনো পঞ্চাশের কবি করেছেন কি না সন্দেহ। স্তন, জঙ্ঘা, যোনি, জঘণ, বগল, গ্রীবা, বাহু, উরু, নিতম্ব, লেহন-চোষণ, প্রৌঢ়ার ঢলঢলে স্তন — কিছুই বাদ যায় নি তাঁর দৃষ্টি থেকে; কবিতায় উল্লেখ বা উপকরণ থেকে। (সিকদার ২০১০ : ৭৩)

বস্তুত শামসুর রাহমানের কাব্যসৃষ্টি যতই এগিয়েছে ততই তিনি নারীদেহকে উন্মোচন করেছেন সৌন্দর্য ও কামনার আধার করে অবিরাম ও অসংকচে। কিন্তু পরিণামে কখনোই তা দেহসর্বস্বতাতে পর্যবসিত হয় নি।

দ্বিতীয় কবিতাটিতে আছে প্রেমিকার প্রতি ঘৃণা ও অসম্মান, যা শামসুর রাহমানের প্রেমের কবিতায় বিরল দৃষ্টান্ত। দয়িতাকে ঘৃণাভরে সম্বোধন করেছেন কবি, কেননা সে ভেবেছিল তার বিচ্ছেদে প্রেমিক আত্মহত্যা করবে এবং এই চিন্তা যেন তাকে সুখস্পর্শ দিচ্ছিল। এই দর্পিতার প্রতি কবির আক্রোশ ও ঘৃণা ব্যক্ত হয়েছে কবিতাটিতে, যা হয়তো পূর্বের 'একটি প্রস্থান, তার অনুষঙ্গ'-তে নেই । সর্বশেষ কবিতাটিতে প্রৌঢ় কবির তরুণীর প্রতি ভালোলাগা পুনর্ব্যক্ত হয়েছে।

দুঃসময়ে মুখোমুখি (১৯৭৩)-তে কবির প্রেমভাবনার কিছু চেনা কিছু অচেনা রূপ এবং বাসনার কিছু চোরাগলির উন্মোচন রয়েছে যা পাঠককে বিস্ময়ে হতবাক করে দিতে পারে, ভীষণ বিব্রত করে তুলতে পারে কিংবা সত্তাজুড়ে ছড়িয়ে দিতে পারে দারুণ অস্বস্তি। প্রথমেই 'তুমি অন্তর্হিতা' কবিতাটি নেয়া যেতে পারে। এখানে প্রেমিকা অন্তর্হিতা, তবে বোঝাই যাচ্ছে যে, চিরতরে নয় এই বিচ্ছেদ সাময়িক। কিন্তু স্বল্প সময়ের এই বিচ্ছেদে প্রেমিক এখানে কাতর নয়, উন্মাদপ্রায়। শীঘ্রই তাঁর উন্মত্ততা ছড়িয়ে পড়ে সর্বত্র, নির্দোষ পথচারী, বিত্তবান মহিলা কেউ-ই রক্ষা পাচ্ছে না প্রেমিকের ক্ষোভ-আক্রোশ থেকে। তাঁর মনে হচ্ছে আশেপাশের সবকিছুই যেন সমস্বরে বলছে "তুমি অন্তর্হিতা", এমন কি অন্ন-বস্ত্রের দাবিতে শহরের রাস্তায় এগিয়ে চলা ঝাঁঝালো মিছিলের পোস্টারেও এই প্রেমিক দেখতে পাচ্ছেন লেখা আছে "তুমি অন্তর্হিতা"। ঘরে ফিরে দেখতে পেলেন দরজা-জানালা-দেয়াল-লেখার টেবিল সর্বত্র একই কথা লেখা রয়েছে। কবিতা লিখতে গিয়ে প্রতিটি পংক্তির ফাঁকে ফাঁকে কে যেন তাঁকে দিয়ে লিখিয়ে নেয় সেই একই কথা। তাঁর বর্বরতার শিকার আঙিনায় চরে বেড়ানো পোষা হাঁসটি, যাকে আঘাতে রক্তাক্ত করে পরক্ষণেই তিনি শুশ্রূষার হাত বাড়িয়ে দেন, কিন্তু নিজের ক্ষত থেকে যে অবিরল রক্তধারা বইছে সেখানে তিনি শুশ্রূষাবিহীন, আর প্রতি রক্তফোঁটা ঝরছে "তুমি অন্তর্হিতা" উচ্চারণে। কবির বিরহানুভূতি এসব ক্ষেত্রে অবসেশন (obsession)-এ পর্যবসিত।

'আমার ভালোবাসা' কবিতায় সকল অসুন্দরের বিপরীতে কবি তাঁর নির্মল ভালোবাসাকে আবাহন করেছেন। 'ইলেকট্রিকের তার ছেড়ে'-তে প্রেমিকের জীবনে তার দয়িতার অপরিহার্যতার কথা আছে। 'সাধারণ বাড়ি' নামক কবিতায় সকল তুচ্ছতা, জীর্ণতা সত্ত্বেও সাধারণ একটি বাড়ি অসাধারণ হয় কেননা সেখানে বাস করে তাঁর ভালোলাগা নারী।

এই কাব্যে কয়েকটি কবিতায় কবি মানবচরিত্রের অন্ধকার দিকটি তুলে এনেছেন, কখনো আত্মস্বীকারোক্তির মাধ্যমে আবার কখনো ব্যক্তির মগ্নচৈতন্যের তলদেশে বিচরণ করে তারই একান্ত ভাবনার প্রতিফলন ঘটিয়ে। ঠিক প্রেমের অনুভূতি নয় বরং লিবিডোই এই কবিতাগুলির মুখ্য বিষয়। এ-বিষয়ে আমরা দুজন সমালোচকের মূল্যায়ন উল্লেখ করব, তার মধ্যে প্রথম জনের মতে, — "এইসব কবিতা লিখে শামসুর রাহমান চিন্তার কতকগুলো আড়ষ্টতা ভেঙে দিয়েছেন; কয়েকটি দেয়াল সবল হাতে চুরমার করে দিয়েছেন। এর ঐতিহাসিক মূল্য থাকবে।" (রশীদ, ২০০৩ : ১৩৮) দ্বিতীয় জনের মতে, — "যৌনপ্রসঙ্গ শামসুর রাহমানের কবিতায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। প্রথম দিকে, *প্রথম গান, দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে* থেকে, চাপা দিয়ে যাচ্ছিলেন; কিন্তু যতোই বয়সের দিকে অগ্রসর হন তিনি, যৌন চাপে ততোই ফেটে পড়তে থাকে অবদমনের ঢাকনা।" (হুমায়ুন ২০০৪ : ১০২) এ-পর্যায়ে প্রথমেই আসে 'ক্ষমাপ্রার্থী' কবিতাটি। এখানে মৃত বন্ধুর লাশ দেখতে তার বাড়ি গিয়ে শোককাতর, স্মৃতিতাড়িত ব্যক্তি স্বীকারোক্তি দেয় —

... ইতিমধ্যে তোমার রোরুদ্যমানা স্ত্রী-র
ব্লাউজ-উপচে-পড়া কম্পমান স্তন আড়চোখে
নিলাম বিষম দেখে, অবাধ্য অসভ্য রক্তে ডাকে বার-বার
লালচক্ষু তৃষিত কোকিল। ('ক্ষমাপ্রার্থী', *দুঃসময়ে মুখোমুখি*)

যদিও এ-অসভ্যতা অসম্ভব নয়, তবুও এ-রকম একটি পরিবেশে এমন আচরণ আমাদের স্বাভাবিক চিন্তার জগতকে একটু নাড়িয়ে দেয়। কিন্তু 'এক মহিলার ভাবনা' কবিতাটি জৈবিক ক্ষুধার যে-রূপ প্রকাশ করেছে, তা ব্যভিচারের পর্যায়ে চলে যায়। এক অসুস্থ বিকারকেই মূর্ত করে তুলেছেন কবি মা-কর্তৃক আপন পুত্রকে কামনা-সঙ্গী হিসেবে চাওয়ার মধ্য দিয়ে। মহিলাটি বিধবা, একমাত্র কন্যা স্বামীর ঘর করছে আর একমাত্র পুত্র কখন ঘরে আসে, কখন থাকে না তা টের পাওয়া দায়, দিন কাটে তার ঘরের চার দেয়ালের নির্জনতায় কিংবা সবু বারান্দায় পায়চারি করে, অথচ শরীরে বাসনার অঙ্গার দগ্ধ করছে তাকে প্রতিনিয়ত। এমতাবস্থায় সে শয্যায় কামনা করছে আপন পুত্রকেই। ইডিপাস-জোকাস্টার কথা স্মরণে রেখেও বলা যায় যে, নিঃসন্দেহে এটি আমাদের স্বাভাবিক চিন্তার দেয়ালকে চুরমার করে দেয়ার মতো বিষয়। 'পাশাপাশি' এ-পর্যায়ের আরেকটি উল্লেখযোগ্য কবিতা। নারীর শরীর ঘিরে আশ্লেষ-ক্ষুধার বহিঃপ্রকাশ কবিতাটিতে আছে। স্নানঘরে স্নানরত প্রেমিকা আর তার জন্যে অপেক্ষমান প্রেমিক একাকী বসে ড্রইংরুমে। নিমেষেই অবচেতনের অন্ধকার ভেদ করে বেরিয়ে আসে আদিম প্রবৃত্তির ক্ষুধা। কল্পনায় প্রেমিকার নগ্নদেহ উন্মোচিত হতে থাকে তার মনশ্চক্ষুতে। কিন্তু স্নানসমাপনান্তে যখন সেই নারী তার সামনে আসে তখন কিন্তু কামনার বহ্নি নির্বাপিত হয়ে চলে হার্দ্যিক সংলাপ। নারীদেহের

অনুপুঙ্খ বর্ণনায় শামসুর রাহমান ষাটের দশকের অনুজ কবিদের সগোত্র না হলেও উল্লিখিত কয়েকটি কবিতায় তাঁকে অনেক বেশি খোলামেলা মনে হয়, যা প্রথম পর্যায়ের শামসুর রাহমানে ছিল অনুপস্থিত। দেহ-মনের যৌথতায় যে প্রেম, শামসুর রাহমান তাতেই বিশ্বাসী ছিলেন, এ-কথা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। কিন্তু উল্লিখিত কবিতাগুলোতে সেই আশ্লেষ-আকাঙ্ক্ষা এবং ক্ষেত্রবিশেষে বিকৃতি ও অজাচারই মুখ্য হয়ে উঠেছে। সুতরাং এখানে তিনি প্রেম নয়, হয়ত বাসনার অন্ধকার দিকটিই প্রকাশ করতে চেয়েছেন বলা যায়। যদিও খুব সামান্য সংখ্যক কবিতাতেই শামসুর রাহমান দেহজ কামনাকে প্রাধান্য দিয়েছেন, কেননা তা তাঁর মৌল প্রেরণা নয়। তিনি মূলত প্রেম ও সৌন্দর্যের কবি।

'তোমাকে দেখে' কবিতাটি শুরুতে মদির কামনা উদ্রেক করলেও এটি শেষ হয় প্রেমের জয়গানে। প্রেমিকাকে দেখে অনেক দুঃখ ভুলে যেতে পারেন কবি– নিমেষেই। তাঁর এই নারী আগুন রঙের শাড়ি প'রে দাঁড়ায়, কখনো বা গৈরিক ডিভানে যুগল উরু ছড়িয়ে বসে, ঠোঁটের কোণে জমে মদির শিশির। 'পাশাপাশি'-র নারী সদ্যস্নাতা শরীরে বিদেশি সুরভি মেখে সোফায় বসে চমৎকার ভঙ্গিতে, শাড়িতে সবুজ লতা, খোঁপায় টকটকে গোলাপ। তার হার্দিক আলাপচারিতায় প্রেমিক ভুলেই যায় যে, তাকে এই সৌন্দর্য ও মনোরম পরিবেশ ছেড়ে যেতে হবে বর্ষার বিড়ম্বনা বরণ করে বহুদূরে নিজ গন্তব্যে।

ফিরিয়ে নাও ঘাতক কাঁটা (১৯৭৪) যুদ্ধের বিভীষিকা ভুলে জীবনের দিকে, প্রেমের দিকে প্রত্যাবর্তনের কাব্য। তিনি কাঁটার পরিবর্তে গোলাপ নিতে উন্মুখ। কিন্তু তারপরেও এই গ্রন্থের কবিতাসমূহের শরীর থেকে ভীতিচিহ্নগুলো পুরোপুরি দূরীভূত হয় নি। কখনো আড়ালে আচ্ছাদনে যুদ্ধের তাণ্ডব ও সন্ত্রাসের পরোক্ষ প্রভাব দেখা যায়। আবার ক্ষেত্রবিশেষে যেমন প্রেমের ক্ষেত্রে তাঁর আবেগ প্রতিহত হলে কখনো কখনো তাঁর শান্ত খোলসটি খুলে বেরিয়ে এসেছে অসহিষ্ণুতার উগ্র ও চণ্ডমূর্তি।

'কতদিন' কবিতায় আছে প্রেমিকার অপেক্ষায় বিমর্ষ প্রেমিকের দুঃসহ প্রহরের বর্ণনা। দয়িতা যখন তার ঘরে আসে তখন

> পুরনো চৌকাঠ
> খিলখিল হেসে ওঠে, নিমেষে নর্তকী হয় জানালার পর্দা,
> আমি নিজে হয়ে যাই জন্মদিন–দীপাবলি, চন্দ্রিল সোনাটা,
> বানায় উদ্যান এক অগোচরে। অথচ যখন চলে যাও
> আমার হৃদয় হয় শীতাক্রান্ত সন্ধ্যার শ্মশান। ('কতদিন', *ফিরিয়ে নাও ঘাতক কাঁটা*)

'ইন্দ্রজাল', 'প্রমাণ', 'যদি তুমি', 'দুই তীর' কবিতাগুলোতে ব্যক্ত হয়েছে প্রেমের বিচিত্র অনুভবপুঞ্জ। প্রথমটিতে আছে সময়ের করাল চাকায় পিষ্ট জীবনে জরার অপ্রতিরোধ্য আগমনের বেদনা। বস্তুজগতের সবকিছুই পুরোনো হয়ে যায় এক সময়, কিন্তু কবির প্রিয়া সদাই নতুন। দ্বিতীয় কবিতাটিতে প্রেমিকের কাছে ভালোবাসার প্রমাণ চেয়েছে প্রেমিকা। তার জবাবে প্রেমিকের বক্তব্য ছিল বসন্ত আসলে যেমন চারিদিকে ফুলের সমাহার ও সৌরভ ছড়িয়ে পড়ে, উন্মীলনের গৌরবে, ভালোবাসাও তেমনি স্বতঃপ্রমাণিত। তৃতীয় কবিতাটিতে আছে প্রেমিকার মৃত্যু হলে প্রেমিকের এবং সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত চরাচরের কী

ভীষণ দুর্গতি হবে, সেই কথা। চতুর্থ কবিতাটিতে আছে বাস্তবে প্রেমাস্পদকে পাওয়া যাচ্ছে না বলে স্বপ্নের বিস্তৃত পরিমণ্ডলে তাকে একান্ত করে পাবার আকাঙ্ক্ষা।

'দরজার কাছে' কবিতাটি মনে করিয়ে দেয় 'তুমি অন্তর্হিতা'র প্রেমিকা-বিচ্ছেদ-কাতর উন্মত্ত প্রেমিককে। অন্তরে তার সঙ্গে মিলনাকাঙ্ক্ষা দুর্নিবার, কিন্তু প্রেমিকার দ্বার রুদ্ধ। এই প্রতিবন্ধকতা প্রেমিককে প্রথমত কাতর করে তোলে, প্রেমিকার প্রতি তার করুণ মিনতি যেন তাকে বাইরে না রাখে এবং এসে দেখে যায় —

ঝঞ্ঝাহত জাহাজের মতো আমি টলছি ভীষণ।
আমাকে দেখলে কেউ এ মুহূর্তে ভাববে নির্ঘাৎ,
ভিক্ষান্ন চাইছি আমি, যদিও আমার
সমস্ত শরীরে
ভালোবাসা তার তপ্ত কাঞ্চনের মতন ফেস্টুন
দিয়েছে উড়িয়ে।
বাইরে রেখো না আর; তোমার মুখের
মধুর নোনতা স্বাদ, ঈষদুষ্ণ সময়-ভোলানো
আলিঙ্গন এ মুহূর্তে একান্ত জরুরি।

এখানে আমরা প্রেমিকার দেহপ্রার্থী বাসনাদগ্ধ এক প্রেমিককে দেখতে পাই। বিশেষত ঐ মুহূর্তে যখন তাঁর দয়িতার আলিঙ্গন একান্ত জরুরি ছিল, অথচ তিনি রুদ্ধদ্বারে প্রতিহত হয়ে ফিরে যাচ্ছেন, ফলত তাঁর অবদমিত কামনা বিস্ফোরণোন্মুখ রূপ নেয়। আকাঙ্ক্ষিতার সঙ্গে অপূর্ণ আসঙ্গলিপ্সা এই প্রেমিকের মধ্যে সঞ্চার করে বিকারের — ক্ষোভ, রোষ, ধ্বংসের এক আগ্রাসী মূর্তিতে তার বহিঃপ্রকাশ ঘটে। যদি তিনি বারবার বন্ধ দরজায় এসে ফিরে যান তবে সমস্ত শহরে দাউ দাউ আগুন ধরিয়ে দেবেন, যা হাজার ফায়ারম্যান চেষ্টা করেও নেভাতে পারবে না। তিনি গহন নদীতে স্টিমার ডুবিয়ে দেবেন, রেললাইন উপড়ে ফেলবেন, মিউনিসিপ্যালিটির সমস্ত ট্রাক ধ্বংস করে ফেলবেন, জেলখানার দেয়াল লাথি মেরে লোপাট করবেন, ডিআইটির ঘাড় মটকে দেবেন। দরজার বাধার কারণে যদি প্রেমিকার মদির তাপ তাঁর শিরায় শিরায় না নিয়ে ফিরে যেতে হয় তবে তিনি গণতরঙ্গিত চৌরাস্তায় হাতবোমা ছুঁড়বেন দিনদুপুরেই। 'আজ চাকা বন্ধ' বলে পল্টনে জনসভা ডাকবেন, বেতার ভবন জবরদখল করবেন। মোট কথা দয়িতাকে পাবার ক্ষেত্রে যে বাধা, তা যে-কোনো মূল্যে গুঁড়িয়ে দেবার এক জেদী প্রত্যয় এখানে প্রকাশ পেয়েছে। একটি বিষয় এখানে লক্ষণীয় যে, এই প্রেমিক তার প্রেমিকার সঙ্গে মিলনের পথে বাধাগ্রস্ত হয়ে যে তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে এবং সেখানে যে ব্যাপক হিংস্রতা ও ধ্বংসের ফিরিস্তি দিয়েছে তা অব্যবহিত অতীতের যুদ্ধকালীন পরিস্থিতির কথা মনে করিয়ে দেয়। আমরা জানি যে, শামসুর রাহমান যুদ্ধকালীন প্রায় পুরো সময়টাই শত্রুপরিবেষ্টিত ঢাকা শহরে এক বিভীষিকাময় পরিস্থিতিতে কাটিয়েছেন। চোখের সামনেই স্বদেশবাসীর ওপর দখলদারবাহিনীর হত্যা, লুণ্ঠন, অপহরণ, অগ্নিসংযোগ ইত্যাকার মানবতাবিরোধী ঘটনা ঘটতে দেখেছেন। একজন সংবেদনশীল কবির সেই অসহায়ত্ব, বেদনা, ক্ষোভ বাণীবদ্ধ হয়ে আছে *বন্দী শিবির থেকে* কাব্যগ্রন্থে। যুদ্ধের ভয়াবহতা ভুলতেই যেন তিনি *ফিরিয়ে*

নাও ঘাতক কাঁটা-তে প্রেমে মগ্ন হতে চেয়েছেন, প্রেমিকা-দেহ-লগ্ন হতে চেয়েছেন, কিন্তু বাধার দেয়াল তাঁর সকল ক্ষমা ও ধৈর্যকে বিলীন করে দিয়েছে। প্রৌঢ় শামসুর রাহমানের প্রেম 'দরজার কাছে' কবিতায় তারুণ্যের শক্তি-দীপ্তি-প্রগলভতা ও হার না মানা ঋজু শিরদাঁড়ায় উজ্জ্বল উচ্ছল। সমালোচকের মূল্যায়নে এই কবিতায় "শামসুর রাহমানকে মনে হয় এক উন্মত্ত তরুণ, যে একাত্তর ভেদ ক'রে উঠে এসেছে, রক্ত পেরিয়ে এসেছে, যার মাথায় দীর্ঘ চুল, হাতে মারণাস্ত্রের স্মৃতি, পরনে ঢোলা জিনস, আর অদৃশ্য হৃৎলোকে প্রেমের রক্তপাত; — তাই তাঁর সমস্ত চিত্রকল্পে জড়ো হয়েছে তছনছ-করা দৃশ্যদৃশ্যান্তর।" (হুমায়ুন, ২০০৪ : ৯৮) শামসুর রাহমানের একটি কবিতায় সত্তর দশকের যুবার সাক্ষাৎ মেলে, যার জীবন থেকে সত্য-সুন্দর সুদূরপরাহত। রক্তাক্ত অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে আসা এ-তরুণের আলোর প্রত্যাশা, ভালোবাসার নারীর ওষ্ঠে চুম্বন এঁকে দেয়ার বাসনা, কোনোটাই পূর্ণ হয় না। তাই শুধু

> সিগারেট-জোনাকির খেলা চলে অন্ধকারে, ভাঙা
> পাখির বাসার মতো কিছু স্মৃতি থাকে প'ড়ে ক্লিষ্ট অ্যাসট্রেতে।
> ....
> প্রায়শই পথিকের মুখে দ্রুত
> উপদ্রবি অন্ধকার ছড়িয়ে বেড়ায়, যতবার
> ইস্পাতি পিস্তল তার উগরায় ধোঁয়া, ততবার সত্তরের
> যুবা খায় চুমো হিংস্র অনুরাগে তপ্ত কালো নলে। ('চুম্বন', *আমি অনাহারী*)

'যখন তোমার কথা ভাবি' কবিতাটি প্রেমিকার কথা ভাবলে তাঁর জীবন-জগৎ-পারিপার্শ্বিক কতটা মধুময়, আনন্দঘন, সুন্দর ও অর্থময় হয়ে ওঠে তার বিবৃতিতে ছাওয়া।

আদিগন্ত নগ্ন পদধ্বনি (১৯৭৪) কাব্যগ্রন্থ উৎসর্গ করা হয়েছে নিরুপমাকে। দয়িতাকে 'নিরুপমা' সম্বোধন করার মধ্য দিয়ে যদিও বিষয়টি পরিষ্কার নয় যে প্রকৃতপক্ষে এটি তার নাম , না কি কবিপ্রদত্ত কোনো বিশেষণ কিংবা নামপদ, তবুও এর মাধ্যমে প্রেমিকার শরীরী রূপ একটি সম্বোধনের আধার পেল। এই কাব্যের কবি প্রৌঢ়, কিন্তু প্রেমের ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী কাব্যের মতোই তারুণ্যসুলভ আবেগে মথিত। কোথাও সেই আবেগ স্বাভাবিকের সীমা ছাড়িয়ে গেছে। শরীরী কামনার বাঁধভাঙা উচ্ছ্বাসও এই কাব্যে দেখা যায়।

'শান্তি পাই' কবিতাটিতে আছে প্রিয়তমার নিবিড় সান্নিধ্যে কবির জীবন জুড়ে যে অনাবিল শান্তি নেমে আসে তার উচ্ছ্বসিত বর্ণনা। 'কী পরীক্ষা নেবে?' শীর্ষক কবিতায় বোঝা যাচ্ছে প্রেমিকা পরখ করে নিতে চাইছে প্রেমিকের আবেগের বিশুদ্ধতা। জবাবে প্রেমিক যে আবেগ প্রকাশ করে তাতে বৈষ্ণব পদাবলীর কৃষ্ণবিরহে রাধার ভাববিভোরতার কথাই যেন আমাদের স্মৃতিতে জাগর হয়ে ওঠে, কেননা এখানে প্রেমিক জপমালার পরিবর্তে প্রেমিকার নাম জপে, তার ছায়া যেখানে পড়েছে শুধু সেখানে ওষ্ঠ রেখেই এই প্রেমিক কাটাতে পারে অনেক আলোকবর্ষ, দয়িতার উদ্দেশে সাঁতার না জেনেও দ্বিধাহীন নেমে যেতে পারে গহন নদীতে, পাড়ি দিতে পারে অগ্নিপথ, পাথরে ফোটাতে পারে ফুল। যে-দিকেই তাকায় সে সর্বত্রই সব কিছু ছাপিয়ে ভেসে ওঠে প্রেমিকার মুখাবয়ব। তার প্রতীক্ষা, চুম্বন, হাত-ধরা সবই সেই একজনের জন্যেই। তারপরেও যদি সেই নারীর

কোনো সংশয় থাকে তবে তাকে বিষপাত্র তুলে ধরার জন্য বলছে প্রেমিক এবং ঐ গরল নিমেষেই উজাড় করে ভালোবাসার প্রমাণ দিয়ে যাবে সে দ্বিধাহীন চিত্তে, — দয়িতার কাছে এ-যেন তার দৃঢ় অঙ্গীকার। 'অমন তাকাও যদি' কবিতাটিও একই আবেগে থরোথরো। 'কোনো কোনো মুহূর্তে হঠাৎ'-এ আছে সর্বব্যাপী প্রেমাস্পদকে অনুভবের বর্ণনা। প্রণয়িণীর উপস্থিতিতে কেমন দ্রুত পাল্টে যেতে থাকে দৃশ্যপট, তার ঐন্দ্রজালিক প্রভাবে প্রেমিকের সবকিছুই কেমন করে দয়িতাময় হয়ে যায় তার বিবরণ গাঁথা আছে এই কবিতায়। প্রেমিকার জন্যে নিজেকে যখন যেমন খুশি বদলে ফেলতে কোনো আপত্তি নেই, এমন কি প্রয়োজনে নিজেকে আমূল বদলে ফেলতেও পারেন এই প্রেমিক, এমন আবেগ প্রকাশ পেয়েছে 'বদলে ফেলি' কবিতায়। শামসুর রাহমানের প্রেমের কবিতায় এই উথাল-পাথাল-মত্ত আবেগের কবিতাগুচ্ছের একটি স্বতন্ত্র মর্যাদা রয়েছে। এক্ষেত্রে পরাধীনতার শৃঙ্খল মুক্তির আনন্দ যে কম-বেশি প্রভাব বিস্তার করেছে এরকম অনুমান করাটা অযৌক্তিক নয়। আবার প্রেমের শান্ত-মধুর, লজ্জা-বিধুর থরোথরো আবেগ-কম্পনের পাশাপাশি মত্ত আবেগের দাপাদাপি প্রেমেরই একটি চরম প্রকাশ, যা কবির প্রেমভাবনার বৈচিত্র্যের চিহ্নায়কও।

এক ধরনের অহংকার (১৯৭৫) গ্রন্থে সংকলিত বেশ কিছু কবিতায় কবির প্রেমানুভূতি ও প্রেমভাবনার পরিচয় পাওয়া যায়। স্বদেশ ও দয়িতা এবং তাঁর কবিতা ও দয়িতার অভেদ কল্পনা রয়েছে দুটি কবিতায়। শামসুর রাহমানের প্রেমভাবনার অন্যতম মূলসূত্র অর্থাৎ শরীর ও মনের যৌথতাতেই যে প্রেমের পূর্ণ প্রকাশ, এই বিষয়টি রয়েছে এ-কাব্যের দু-একটি কবিতায়। আছে নারী-পুরুষের দাম্পত্য-জীবনের উন্মোচন, বিশেষত স্ত্রীর চোখে স্বামী কেমন, তার একটি মূল্যায়ন রয়েছে, যা বর্ণিত হয়েছে স্ত্রীর উক্তিতে। উল্লিখিত বিষয়টি পাওয়া যায় 'তাঁর চোখে আমি' শীর্ষক কবিতায়। ঠিক প্রেমের কবিতা না হলেও স্ত্রীর চোখে স্বামীর মূল্যায়নের মধ্য দিয়ে নারী-পুরুষের দাম্পত্যসম্পর্কের দিকটি উন্মোচিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত ছোটগল্প 'স্ত্রীর পত্র'-এর মৃণাল স্বামীগৃহ ত্যাগ করে স্বামীর কাছে লিখেছিল এক চরমপত্র। সেখানে তার দীর্ঘ দাম্পত্যজীবনের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে সামন্ত সমাজের পরিবার কাঠামোয় নারীর নিপীড়িত হবার চিত্র পাওয়া যায়। শেষ পর্যন্ত এই বন্ধন ত্যাগ করে সে এই ব্যবস্থার অমানবিকতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়। আলোচ্য কবিতায় যদিও আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার দিকটি ততটা মুখ্য হয়ে ওঠেনি, মুখ্য হয়ে উঠেছে আধুনিক নারী-পুরুষের সম্পর্কের জটিলতা, বহির্বাস্তবতার চেয়ে অন্তর্বাস্তবতাই এখানে অধিক গুরুত্ব পেয়েছে, এবং এই স্ত্রীটিও যে বেহুলার মতো পতিগতপ্রাণ তা-ও নয়। তবে এই কবিতায় ক্ষীণ আকারে হলেও বর্তমান যুগে সংসারে নারীর অবস্থান সম্পর্কে কিছুটা ইঙ্গিত পাওয়া যায়। একটি যুগ অতিক্রান্ত এই দম্পতির জীবনে এসেছে পাঁচটি সন্তান। অথচ এতকাল পরেও লেখক স্বামীটি তার কাছে দুর্বোধ্য পুঁথির মতোই রয়ে গেছে। নিজের গৃহে যিনি বাস করেন পান্থজনের মতো, যেন তাঁর প্রকৃত গন্তব্য অন্য কোথাও, অন্য কোনোখানে। অথচ মদির শয্যায় নিবিড় মুহূর্তে যে অন্তরঙ্গতা তৈরি হয়, সেটাই কি ভালোবাসা কিংবা তিনি কি স্বামীর হৃদয়ের এতই একান্ত কিছু, এই দ্বিধা জন্মে স্ত্রীর অন্তরে। কেননা তিনি যখন দেখেন তার স্বামী সুখে তন্ময় হয়ে সিগারেট ফুঁকছে, তখন মনে

হয় সেই জ্বলন্ত বস্তুটি স্বামীর কাছে তার চেয়েও যেন অধিক অন্তরঙ্গ। যখন তিনি হঠাৎ প্রবল আবেগে খাতা টেনে নিয়ে টেবিলে বসে অত্যন্ত ঝুঁকে লেখায় মগ্ন হন, তখন সংসার যেন কুটোর মতো ভেসে যায়। লেখক বলেই বীণাপাণি তার বাহুলগ্ন আর লক্ষ্মী দরজা থেকেই ফেরত যান। চেষ্টা করেও 'লোকটার' মাথা থেকে এ-লেখার ভূত তাড়াতে পারেন নি তিনি। খিটিমিটির সংসারে আবার কেমন করে ঠিকঠিক দায়িত্বভারও বহন করেন এই দুর্বোধ্য ব্যক্তি। কোনো বিকেলে সেজেগুঁজে তাঁর পাশে এসে দাঁড়ালে তিনি হয়তো থেকে যান সম্পূর্ণ উদাসীন, চরম কৃপণের মতো তাঁর মুখ থেকে বের হয় না একটিও প্রশংসাবাক্য কিংবা নিতান্ত সপ্রশংস দৃষ্টি। অথচ সেই তাকেই গৃহকর্ম থেকে হঠাৎ ছোঁ মেরে এনে দেখান তিনি আঙিনায় বিচরণরত দুটি পাখির সৌন্দর্য। এ-রহস্য-পুরুষই আবার সাধারণ হয়ে যায় যখন স্ত্রীর সামনেই অন্য মহিলাকে হানে কুকুর-নজর, কামনা-ভেজা সেই দৃষ্টি স্ত্রীকে অপমানে করে তোলে জর্জরিত। প্রকৃতপক্ষে আলোচ্য কবিতাটি নারী-পুরুষের সম্পর্কের জটিল-জাল এবং জীবনের গূঢ় সত্যকেই উদ্ভাসিত করে। তাদের দাম্পত্য-সম্পর্কের সবচেয়ে নিষ্ঠুর সত্যটি ব্যক্ত হয় যখন স্ত্রী বলে —

> পাশাপাশি শুতে হয়, এটাই তো রীতি চিরদিন;
> আমাকে জড়িয়ে ধরে হয়তো সে দিকচিহ্নহীন
> কেমন অদৃশ্য পথে ঘোরে ঘুমঘোরে, ভাবে অন্য
> কারো কথা, হয়তো আবৃত্তি করে কারুর শরীর। আমিও কি অতি বন্য
> স্বপ্নের ঝালর নিয়ে চোখে হু হু শূন্যতায় শুনি আর কারো
> পদধ্বনি? তখন দেখলে কেউ আমাদের বলবে, প্রগাঢ়
> ছাপ নিয়ে রহস্যের খাটে প'ড়ে আছে দুটি মৃতদেহ। এমন কন্দর
> আড়ালেই থাক; আমি তো বেহুলা নই, সে-ও নয় লখিন্দর।

বস্তুত আধুনিক মানুষের আন্তরনৈঃসঙ্গ্য, সম্পর্কের শিথিলগ্রন্থি, জটিলতা ইত্যাদি মানব-মানবীর সম্পর্ককে ঘনিষ্ঠ দুটি মৃতদেহবৎ করে তোলে। কখনোই যেন পরিপূর্ণ জানা বা চেনা হয় না পরস্পরকে। দীর্ঘ পাশপাশি অবস্থানের পরেও থেকে যায় দুস্তর ব্যবধান। প্রত্যেকের মনের অবচেতনেই থাকে গোপন অন্ধকার, যা অনুদ্ভাসিত। কিন্তু তারপরেও এই সত্যকে আড়ালে রেখে, এই রহস্যকে ধারণ করে চলে এ-জীবনের অম্ল-মধুর যাত্রা,– যেখানে একদিকে আছে নির্ভরতা, দায়িত্ব-কর্তব্য এবং মমত্ববোধ অন্যদিকে উপেক্ষা, বঞ্চনা, অনাস্থা, অবিশ্বাস। বেহুলা তার স্বামীকে বাঁচানোর জন্যে যে প্রাণপণ সংগ্রাম-ত্যাগ-তিতিক্ষার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে, সেই পৌরাণিক যুগ যেমন বর্তমান-নারীর সম্মুখে নেই, তেমনি লখিন্দর-রূপী স্বামীও বিরল। কবিতাটি কবির আত্মজৈবনিক হলেও আমরা শামসুর রাহমানের কবিস্বভাব থেকে জানি এ-জীবন তাঁর হয়েও সম্পূর্ণত তাঁর নয়, শেষ পর্যন্ত তা নৈর্ব্যক্তিকই, এবং স্ত্রীর চোখ দুটি যে প্রকৃতপক্ষে তাঁর নিজের কাছ থেকেই অনেকখানি ধার করা সেটিও বলা বাহুল্য। বান্ধব-আড্ডার মৌহূর্তিক উচ্ছ্বাসের পটভূমিতে ব্যক্তিগত দাম্পত্য-সম্পর্ককে কবিতায় উন্মোচনে একদিকে তিনি যেমন অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন তেমনি বিষয়ের সর্বজনীনতায় তা সহজেই হয়ে উঠেছে নির্বিশেষের গল্প। এই দম্পতি যেন আমাদের চেনা ও অভিজ্ঞতার পরিসীমাতেই ব্যাপ্ত, পাশের বাসাতেই হয়তো দেখা মিলবে এদের। তাই আত্মকথনে শুরু হলেও শেষ পর্যন্ত তা অনেকের কথা হয়ে ওঠে।

তবে কবিতাটি অন্যতর কারণেও শামসুর রাহমানের কাব্যভাণ্ডারে এককস্থানীয় বলে দাবি করা যেতে পারে। শামসুর রাহমানকে নারীবাদী কবি বলবেন না কেউ, এ-কথা যেমন সত্য তেমনি আলোচ্য কবিতায় এমন কিছু দিক পাঠকের গোচরীভূত হয় যেখানে নারীর দৃষ্টিকোণ থেকে নারীর কিছু একান্ত অনুভব-বঞ্চনা-অবহেলা-অবজ্ঞার কথা উঠে এসেছে। স্বামীরূপী পুরুষটি নিজের ইচ্ছেমাফিক কখনো তার প্রতি মনোযোগী, কখনো চরম উদাসীন — এমন কি ঠোঁটে ধরে রাখা এক টুকরো জ্বলন্ত সিগারেটও যখন স্ত্রীর চেয়ে অধিক অন্তরঙ্গ বলে মনে হয়, তখন সংসার জীবনে নারীর নিজস্ব চাওয়া-পাওয়ার প্রতি যুগ যুগ ধরে যে উপেক্ষা পুরুষ কর্তৃক হয়ে আসছে সে-দিকটিই উন্মোচিত হয়। বিশেষত যখন 'বিকেলে সেজেগুজে ওর পাশে এসে/দাঁড়ালে' দু'একটা প্রত্যাশিত মামুলি প্রশংসাবাক্যও স্বামীর মুখ থেকে নিঃসৃত হয় না বরং উঠোনে বিচরণরত পাখি-দম্পতির সৌন্দর্য তাঁকে আকৃষ্ট করে তখন স্ত্রীর প্রতি অপরিসীম অবজ্ঞার বিষয়টি আড়াল থাকে না। নারীর বঞ্চনা প্রকট হয়ে ধরা পড়ে আলোচ্য কবিতার ক্ষুদ্র একটি পঙ্‌ক্তিতে যখন স্ত্রী বলেন, 'আমার লাবণ্য চুরি ক'রে/পাঁচটি সন্তান বড় হচ্ছে ...'। প্রকৃতপক্ষে আমাদের সমাজে নারী তাঁর গৃহে স্বামী-সন্তান-পরিজনদের জন্যে কেবল নিজেকে নিঃশেষে ক্ষয় করেই যায়, অথচ তারই উপস্থিতিতে স্বামী অন্য নারীর প্রতি যখন কামনালোলুপ দৃষ্টি হানে তখন নারীত্বের যে চরম অপমান ঘটে, সে-দিকটিও আলোচ্য কবিতায় চমৎকারভাবে এসেছে।

মাতাল ঋত্বিক (১৯৮২) কাব্যে একশ বারটি সনেটে প্রধানত প্রেমের নানা আবেগ-অনুভূতির প্রকাশ দেখা যায়। কোথাও পুরাতন প্রেম নতুন করে ধরা দিয়েছে জীবনের পথে, আবার কোথাও যৌবন সূর্যের পশ্চিম আকাশে হেলে পড়ার কালে নতুন প্রেমিকাকে ঘিরে মনের তারুণ্য জেগে উঠেছে।

গ্রন্থের প্রথম কবিতা 'সে কবে আমার ঘরে'-তে কবির প্রথম জীবনের ভীরুতার কারণে প্রেমে ব্যর্থ হওয়ার স্মৃতি বর্ণিত। 'খরার দুপুরে' কবিতাটিতে প্রেমিকার গান প্রেমিকের অসুস্থ অন্তরে শুশ্রূষার বার্তা বয়ে আনে। কোনো এক পয়লা বৈশাখের খর দুপুরে সবাই যখন বাইরে মেলায় ঘুরে বেড়ায় নতুনের ডাকে, তখন কবি তাঁর কান্তার গৃহে, মুখোমুখি বসে শুনছেন তার গান, যা তাঁর অসুস্থ মনে ভিন্ন জাগরণ আনে। বর্তমানের প্রেমহীন সময় প্রেমদীপ্ত হৃদয়কেও ধ্বংস করে দেবে, এমন একটি বক্তব্য আছে 'কর্ণমূল থেকে' কবিতায়। 'যদি কাসান্দ্রার মতো কেউ' কবিতায় প্রেমের পথে শত বাধা, রক্তপাত জেনেও কবি প্রিয়তমার কাছ থেকে দূরে যেতে নারাজ। এখানে কবি হেলেনের রূপে ট্রয় নগরী ধ্বংসের প্রসঙ্গটি এনেছেন। 'কোথায় শিউলিতলা'-য় প্রৌঢ়ের আড়ালে যে যুবা প্রেমিক তন্বী প্রেমিকার কানে হৃদয়ের নতুন সংহিতা আবৃত্তি করছেন, তাকে যেন প্রেমিকা বয়সের কথা ভেবে ফিরিয়ে না দেয়, সে-কথা বলছেন, কেননা এই প্রৌঢ়-প্রেমিক হৃদয়ের ঐশ্বর্যে শিলীভূত বুকে সহজেই পাথরগলানো প্রস্রবণ জাগানোর ক্ষমতা রাখে। 'কুয়াশায় নিমীলিত' কবিতাটিতে কবি প্রেমিকার শরীরকে প্রবলভাবে কামনা করেছেন। 'যখন আমার কাছ থেকে'-তে দয়িতার সঙ্গে ক্ষণিক বিচ্ছেদের জ্বালা এবং তাকে হারানোর ভয় ব্যক্ত হয়েছে। 'বিদায় গান'-এও শরীরী কামনা প্রবল। 'দিন রাত্রি' সনেটটিতে দিনের বেলায় কবির চেনা পৃথিবীর সৌন্দর্য বর্ণিত হয়েছে এবং তিনি জানেন দিনের শোভা প্রসিদ্ধ, তবুও

তাঁর কাম্য গাঢ় নিশীথ এবং তিনি তারই গান গেয়ে অপেক্ষা করেন ঘুমের প্রহরের, কেননা সেখানেই স্বপ্নের জগতে দেখা মিলবে তাঁর অপ্রাপণীয়ার। 'নাম' সনেটটিতে প্রেমিকের অনুরাগ তাঁকে সাধকে পরিণত করেছে। প্রেমিকার মধুর নাম জপতেই তাঁর আনন্দ, নিমেষেই সেই নাম তাঁর সত্তা ছাড়িয়ে সর্বত্র সর্বময় হয়ে ওঠে। 'প্রকৃতির কাছে' কবিতায় ঈপ্সিতাকে নিয়ে শান্ত মধুর প্রকৃতির কোলে বসেও কবি ভব্যতার কারণে হংস-হংসীর মতো নিবিড় আলিঙ্গনে তাকে বাঁধতে পারেন নি বুকে, যদিও অন্তরে উঠেছিল জেগে আদিমতা। প্রেমাস্পদের শরীর কামনার কথা ব্যক্ত হয়েছে যেসব কবিতায়, সে-পর্যায়েরই একটি কবিতা 'তোমাকে ভাবছি'। 'ফিনিক্সের গান'-এ কবির জীবন যখন নিঃসঙ্গতায় মৃতবৎ হয়ে উঠেছিল, তখন জীয়ন কাঠির স্পর্শে প্রেমিকা এসে তাঁকে বাঁচিয়ে তুলল, তাঁর প্রাণে ঢেলে দিল গান। কিন্তু কবি জানেন এ-মহাদান ক্ষণিকের, প্রেয়সী তাঁকে ছেড়ে চলে যাবে। তাই কবির ব্যাকুল জিজ্ঞাসা, অন্ধকার রাতই যদি প্রাপ্য তবে কেন সে-নারী তাঁকে সূর্যোদয় এনে দিল। 'তোমার সান্নিধ্যে' প্রেমের ক্ষেত্রে হৃদয়ের সঙ্গে সঙ্গে শরীরী-প্রেমের কথা এসেছে। কবি তাঁর ললনাকে স্মরণ করিয়ে দিতে চান বাঙালির প্রথম প্রেমের নায়িকা রাধার কথা, যে প্রিয়সঙ্গলাভের জন্য কত তিমির-শঙ্কিল-পঙ্কিল পথ অতিক্রম করেছিল। 'তিরিশ বছর' সনেটটিতেও প্রৌঢ় প্রেমিকের প্রেমাবেগ ব্যক্ত হয়েছে। সাতচল্লিশের সীমানায় পেয়েছেন যে প্রেমিকাকে, তিনি যেন তার অপেক্ষায় ছিলেন দীর্ঘ তিরিশ বছর। 'মৃত্যুদণ্ড'-তে প্রেমিকার প্রস্থানজনিত বিচ্ছেদ প্রেমিকের কাছে মৃত্যুদণ্ডের চেয়েও কঠোর শাস্তি বলে মনে হয়। 'যে-কথা বলেনি কেউ'-তে আছে বিদুষী নারীর কথা, যার সঙ্গে ড্রইং রুমের মনোরম পরিবেশে বসে ইতিহাস-রাজনীতি-সমাজ-সাহিত্য ইত্যাদি নিয়ে তুমুল তর্কে মেতে ওঠা যায়। এই নারী তাঁর হৃদয়বাসিনীও বটে। কবির প্রার্থনা, এসব তর্ক ভুলে সে যেন তার শরীরের সমস্ত সৌন্দর্য নিয়ে সম্মুখে উন্মীলিত হয়, আর তিনি তাকে সেই কথাটি বলবেন যা কখনো কোনো প্রেমিক তার প্রেমাস্পদকে বলে নি।

'নীরবই থাকব আজ', 'রক্ষাকবচ', 'তুমি তো এসেই বললে', 'এমন উল্লেখযোগ্যভাবে' শীর্ষক একগুচ্ছ সনেটে পূর্বে একাধিক কবিতায় প্রকাশিত কবির সেই পুরোনো অনুভব—তিনি প্রৌঢ় অথচ তাঁর ললিতা নবীনা, যে তাঁকে ছেড়ে চলে গেছে অথবা চলে যাবে যে-কোনো সময়। প্রিয়ার অনুপস্থিতি এবং তাকে চিরতরে হারানোর ভয় সর্বদাই কবিকে ত্রস্ত করে তোলে। উল্লিখিত সনেটগুলোতে দয়িতা নিষ্ঠুরার মতো তাঁকে ছেড়ে চলে গেছে, আর কবির জন্যে রেখে গেছে তীব্র হাহাকার, স্মৃতির কাঁটা আর ক্ষুব্ধ অসহায় আর্ত একটি জিজ্ঞাসা যে, চলেই যদি যাবে তবে কেন সে এই অবেলায় এসেছিল।

'আমার তৃষ্ণার জল'-এ প্রেমিকা অন্যের হয়েছে তবুও সকল তৃষ্ণা তাকে ঘিরেই। 'আমার ক্ষুধার্ত চক্ষুদ্বয়' কবিতায় প্রেমিকা দেশান্তরে সঙ্গীসহ, তবু এই বিচ্ছেদ ও দূরত্ব তিনি মানতে পারছেন না, প্রেমিকার স্মৃতি ধারণ করেই তাঁর বেঁচে থাকা।

'শুধু দেখি'-তে প্রেমিকার রূপ আর বাংলাদেশের রূপ কবির কল্পনায় একাকার হয়ে যায়। প্রেমিকের গুণাবলি কী কী তা কবি জানেন না, শুধু জানেন প্রিয়তমাকেই ভালোবাসেন, তার এক ঝলক দৃষ্টিপাতে হৃদয়ে বাজে বাঁশি, চোখে জাগে নতুন সভ্যতা,

দীপ্র বীজে ধনী হয় তাঁর মনোভূমি, — এমন বক্তব্য রয়েছে 'প্রেমিকের গুণ' কবিতাটিতে। 'দ্বিতীয় যৌবন' শীর্ষক সনেটে প্রৌঢ়ত্বের ধূসরতায় পৌঁছে কবি নিজেকে সর্বস্ব হারানো জুয়াড়ির মতো ভাবছেন এবং নবীনার নিকট আপন প্রৌঢ়ত্বের জন্য কুণ্ঠা ব্যক্ত করছেন। তবুও তার প্রেমে তিনি যেন ফিরে পান দ্বিতীয় যৌবন।

'একটি আশ্চর্য মুখ' শীর্ষক কবিতায় কবি একটি মুখ স্বপ্নে দেখেন মাঝে-মাঝে, তাকে আবার কখনো দেখেন নীল সমুদ্রের পানি থেকে জেগে ওঠে, সিক্ত ওষ্ঠে তার হাসির গূঢ় ঝলকানি। আবার কখনো দেখেন, অজ্ঞাত শিল্পীর ক্ষিপ্র ছেনি তাকে রহস্যের রানী রূপে নির্মাণ করেছে, চোখে গভীর বাণী নিয়ে নিষ্পলক চেয়ে থাকে। আর এই মুখের প্রতিচ্ছায়াই তিনি দেখতে পান তাঁর বাস্তবের প্রেমিকার মুখে। এখানে একদিকে আমরা শামসুর রাহমানের মধ্যে শিল্পীর ছেনি-বাটালিতে গড়া নারীর মর্মর মূর্তির উল্লেখে তাঁর ক্লাসিক সৌন্দর্যের প্রতি আকর্ষণ দেখি, যা আমাদের বোদলেয়ারের সৌন্দর্যচেতনার কথা মনে করিয়ে দেয়। অন্যদিকে সমুদ্রের পানি থেকে থৈ থৈ যৌবনের সৌন্দর্য নিয়ে জেগে ওঠা নারীর উল্লেখ মনে করিয়ে দেয় প্রেমের দেবী আফ্রোদিতির কথা, যা থেকে কবির রোম্যান্টিক সৌন্দর্যের রহস্যঘনতার প্রতিও আকর্ষণ দেখি। এবং এই দুই রূপের সম্মিলনেই তিনি তাঁর দয়িতার আশ্চর্য মুখটিকেও ফুটিয়ে তোলেন।

'বিচ্ছেদ' কবিতায় কবি স্মরণ করেন কিংবদন্তির প্রেমিক ফরহাদের কথা, যার জীবনে ঘটে নি প্রেমিকার সঙ্গে মিলন এবং বিচ্ছেদেই যার অন্ত। আপন দয়িতার সঙ্গে মিলন না হবার মর্মজ্বালা তিনি বিরহী ফরহাদের বেদনার সঙ্গে এক করে দেখেন। 'কোথায় মনের মুক্তি' শীর্ষক কবিতাটি তাৎপর্যময় একারণে যে, এখানে কবি তাঁর মনের মুক্তি খুঁজতে গিয়ে কখনো মনে করেছেন জনহীন দ্বীপ, পর্বত শৃঙ্গ, গভীর অরণ্য কিংবা ধু-ধু প্রান্তরে আছে কাঙ্ক্ষিত মুক্তি, কখনো মনে প্রশান্তি পেয়েছেন নিসর্গের কাছাকাছি গিয়ে, কখনো বা গ্রন্থপাঠে পেয়েছেন শান্তি। আবার কখনো নান্দনিক চেতনায় রং-তুলি আর বাটালি ছেনির শিল্পকর্মে পেয়েছেন খুঁজে মনের মুক্তি কিন্তু পরক্ষণেই আবার তাঁর মনে হয়েছে প্রকৃত মুক্তি প্রেমিকা-সান্নিধ্যেই।

'শুনি অপরাহ্নে' কবিতায় গ্রিক পুরাণের আর এক প্রেমিক অর্ফিয়ুস-এর প্রসঙ্গ এসেছে, যার বাঁশির সুর এবং সঙ্গীতের অসাধ্য ছিল না কিছুই। তিনি 'বাঁশি বাজাতে বাজাতে যেতেন, আর জড় ও জীব সবাই তার পেছন পেছন যেত। তিনি পাহাড়ের পাথর সরাতে পারতেন; নদীর গতিপথ পর্যন্ত পারতেন পাল্টে দিতে।' (খোন্দকার, ২০০২ : ৯৪) প্রিয়া ইউরিডিসিকে বিয়ের রাতেই হারায় অর্ফিয়ুস এবং প্রিয়াকে ফিরিয়ে আনতে সে পাতালের ভয়াল পথ পাড়ি দিয়ে মৃত্যুপুরীতে যায়, তার বাঁশির সুরে চরাচর স্তব্ধ হয়ে যায়, মুগ্ধ বিস্ময়ে মৃত্যুপুরী স্তব্ধ হয়ে যায়। হেডিসের রাজা প্লুটো বাধ্য হলেন অর্ফিয়ুসের আবেদনে তার স্ত্রীকে ফিরিয়ে দিতে। তবে শর্ত দিলেন, যেন পৃথিবীতে পৌঁছার আগে সে পেছন ফিরে তার স্ত্রীকে না দেখে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যা ছিল নিষেধ তাই করে ফেললেন অর্ফিয়ুস আর চিরতরে হারিয়ে ফেললেন প্রিয়তমাকে। তারপর থেকে মানুষের সঙ্গ পরিত্যাগ করে এই প্রেমিক আমৃত্যু পাহাড়, জঙ্গলে ঘুরে বেড়ান, অবশ্য সঙ্গে ছিল তার মোহন বাঁশিটি।

এই কবিতায় শামসুর রাহমান নিজেকেই অর্ফিয়ুস মনে করছেন, অন্তরবাসিনী তাঁকে ভালোবাসুক আর না-ই বাসুক তিনি তাকে ভালোবাসবেন কোনো কিছু প্রত্যাশা না করেই।

আমরা আগেই জেনেছি, শামসুর রাহমান শরীর ও মনের যুগ্মতায় যে-প্রেম তাতেই বিশ্বাসী। তাঁর এই বিশ্বাস পুনর্ব্যক্ত হয়েছে 'স্থগিত বাসনা' কবিতায়। দয়িতা চায় শরীর-বিবিক্ত প্রেম আর কবি চান শরীর ও মনের যুগ্মতায় যে প্রেম তাকে। তাই তার বারণ সত্ত্বেও তিনি অকূল তৃষ্ণা নিবারণে আগ্রহী। 'কী কঠিন কাজ' কবিতায় একই অনুভব ব্যক্ত হয়েছে।

'মাতাল ঋত্বিক' কবিতাটি এই গ্রন্থের নাম-কবিতা এবং সর্বশেষ কবিতা হিসেবে গ্রন্থিত। আমরা জানি, শামসুর রাহমানের অন্যতম প্রবণতা হচ্ছে কবিতা এবং দয়িতাকে অভিন্ন-কল্পনা। আলোচ্য কবিতায় কবির প্রেমিক সত্তা আর কবিসত্তা খুঁজে পেয়েছে নিজস্ব প্রতীক। তিনি এখানে মাতাল ঋত্বিক এবং প্রেমিকার উদ্দেশে লেখা সকল উচ্চারণই তাঁর ঋগ্বেদ । কেউ শুনুক বা না শুনুক, সে ধ্বনিসমূহ যেন প্রিয়ার কানে সকল সময় গান হয়ে বাজে, এই শুধু তাঁর চাওয়া।

যে অন্ধ সুন্দরী কাঁদে (১৯৮৪) কাব্যগ্রন্থে প্রেমের ক্ষেত্রে কবির একটি উপলব্ধি মুখ্য হয়ে উঠেছে। তিনি জানেন জীবনের পরিক্রমায় তাঁর বর্তমান অবস্থান প্রৌঢ়ত্বের কোঠায়। মনের তারুণ্য অটুট থাকলেও শরীরে জরার আবির্ভাব লক্ষণীয়। তাই নবীনা নারী ক্ষণিকের জন্যে জীবনে এলেও অচিরেই বিচ্ছেদ নেমে আসে। যন্ত্রণা আর নৈঃসঙ্গ্যই হয় তাঁর নিত্যসহচর। কবি এই বাস্তবতা একসময় মেনে নেন এবং প্রণয়কে মননেই ঠাঁই দিতে চান। মূলত এই কাব্যের প্রেমের কবিতাগুলোতে কবির প্রেম স্মৃতি আর কল্পনাতেই গড়া।

এক ফোঁটা কেমন অনল (১৯৮৬) কাব্যগ্রন্থের 'কবিতাপাঠ' ও 'সে-রাতে পার্টিতে তুমি' কবিতা দুটিতে আমরা দেখি নাগরিক অভিজাত নারীকে। 'কবিতাপাঠ'-এ নিভৃত ড্রইং রুমের অনুগ্র আলোয় বিদেশি কবিতা পাঠরতা নারীর স্বরমাধুর্যে বস্তুত সৃষ্টি হয়েছে এক নান্দনিক সৌন্দর্য। কবির কাছে সে মুহূর্তে মনে হলো

> তুমি স্নিগ্ধ, প্রজ্ঞাপারমিতা,
> শুনিয়ে অমোঘ সুর কবিতার চলেছো আমাকে
> নিয়ে দূর ছায়াচ্ছন্ন নিবাসে,

দ্বিতীয় কবিতায় আমরা দেখি নাগরিক অভিজাত শ্রেণির নৈশ-পার্টি। খোলাছাদে নারী-পুরুষের মৃদু কথোপকথন আর জ্যোৎস্নার মদির বিচ্ছুরণ সকলের দেহমনে। আলোচনা চলছে আবহাওয়া, রাজনীতি, চিত্রকলা, ফ্যাশন, দর্শন ইত্যাদি বিষয়ে, ক্যাসেটে বাজছে সরোদ। সেই রাতে পার্টির সকল রূপসীদের মধ্যে কবির মনোনীতা ছিল সবচেয়ে সুদীপ্তা, সুসজ্জিতা রুচিস্নিগ্ধ সাজে। সকলের মাঝে থেকেও এই নারী আলাদা, গল্প করতে করতে হঠাৎ নিশ্চুপ হয়ে কোথায় যেন হারিয়ে যায়, আর তাকে ঘিরেই জেগে ওঠে কবির বাসনা। শামসুর রাহমানের কাব্যভুবনে এই পার্টি-ঘেঁষা নারী এবং ড্রইং রুমে শিল্প-সাহিত্যের আলোচনায় মুখর বিদুষী, রুচিশীল, অভিজাত নারীর একটি বিশিষ্ট স্থান রয়েছে। মূলত

শামসুর রাহমানের কবিতার একটা বড় অংশই এই শ্রেণির নারীদের ঘিরে গড়ে উঠেছে। নৈশ-পার্টি, শিল্প-সাহিত্য-রাজনীতি-দর্শন বিষয়ক কৃত্রিম মেধার কর্ষণ এসব এলিয়টের কাব্যে ('সং অব জে আলফ্রেড প্রুফ্রক', *দি ওয়েস্টল্যান্ড*), বিষ্ণু দে-র কাব্যে (জন্মাষ্টমী, *পূর্বলেখ*)-ও পাওয়া যায়।

গৃহযুদ্ধের আগে (১৯৯০) কাব্যগ্রন্থে বেশ কিছু কবিতায় প্রেমের সঙ্গে লিবিডোর উপস্থিতিও লক্ষ করা যায়। তবে কবিতাগুলো প্রায়শই উৎকট শরীরী আবেদন জাগালেও তাঁর হৃদয়াবেগই শেষ পর্যন্ত মুখ্য হতে দেখা যায়। এ পর্যায়ের একটি কবিতা 'মৃত্যুহীন তালে তালে'। কবিতাটি শুরু হয়েছে কোনো এক তপ্ত দুপুরে গৃহমধ্যে পাখার বাতাসের নিচে প্রেমিকার সঙ্গে সোফায় বসে তার অলোকসামান্য রূপের মাধুরী উপভোগের বর্ণনায়। কৃত্রিম বাতাসের ঝাপটা লেগে নায়িকার কেশরাশি বিস্রস্ত হচ্ছে আর চুলের সে অবাধ্যতা সামলাতে গিয়ে তার 'লবেজান' অবস্থা, তার চিকন ভুরুতে উড়ন্ত পাখির গান, ঠোঁটে হাসির ঝরনা কবিকে মুহূর্তেই ভালোলাগার আবেগে ভাসিয়ে নিয়ে যায় দিগন্ত চিরে বহুদূর দ্বীপ থেকে দ্বীপান্তরে। ধীরে ধীরে কবির দৃষ্টিতে উদ্ভাসিত হতে থাকে প্রেমিকার অনিন্দ্যসুন্দর দেহলতা। নারীর দৈহিক সৌন্দর্যের বর্ণনায় শামসুর রাহমান যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রকৃতিলগ্ন হয়ে ওঠেন এবং যা তাঁর বিশিষ্টতার স্বাক্ষর, এক্ষেত্রেও নেই তার ব্যতিক্রম। যেমন —

> ব্লাউজের ওপার থেকে যুগল ফলের আভা
> বিচ্ছুরিত হচ্ছিল ক্ষণে ক্ষণে। তোমার কোমরে উচ্চকিত
> একটা ভাঁজ, নদীর বাঁক। চোখে অপরূপ সরোবরের স্মৃতি;
> সোফার হাতলে তুমি ঝুলিয়ে দিয়েছিলে পা,
> পায়ের অনাবৃত অংশটি
> পাখির ছড়িয়ে-দেয়া ডানা।

উল্লিখিত স্তবকটি মনে করিয়ে দেয় আধুনিক বাংলা কবিতার আরেক প্রেমের কবি বুদ্ধদেব বসুর কথা। তিনিও আরশিতে প্রতিফলিত নায়িকার শরীরী সৌন্দর্যকে প্রকৃতির অনুষঙ্গে ফুটিয়ে তোলেন। যেমন —

> আরশির মুখে ছোটো দুটি ঠোঁট–আপেল পাকা
> আরশির বুকে বাঁকা-রেখা বুক–বকের পাখা, (আরশি, *কঙ্কাবতী*)

মূলত আধুনিক কবি এভাবেই মূর্ততার মধ্য দিয়ে বিমূর্ত সৌন্দর্যের জগতে পাঠককে নিয়ে যান এবং পরিণামে পাঠক পুরস্কৃত হয় এক অনাবিল সৌন্দর্য অনুভবের পরিতৃপ্তিতে। শামসুর রাহমান এই অনন্য রূপমূর্তি নির্মাণ করেই থেমে যান নি, বরং ঐ রূপময়ীর কাছে নিজেকে করেছেন অকুণ্ঠ সমর্পণ। তিনি পবিত্রতায় স্নাত এক গাঢ় চুম্বন এঁকে দেন তাঁর মধুরতমার পায়ের উজ্জ্বল নগ্নতায়। স্মৃতিতে জেগে ওঠে প্রাচীন যুগের কোনো রূপসী রানীর পায়ে হয়তো এমন করেই চুম্বনের অর্ঘ্য রেখে যেত তার গোপন প্রেমিক। কবির বাস্তব থেকে কল্পলোকে, বর্তমান থেকে অতীতে এবং অতীত থেকে বর্তমানে পরিক্রমণ এভাবেই চলতে থাকে। একই সঙ্গে তাঁর কবিতায় প্রেমের সঙ্গে দেহ এবং দেহ থেকে সৌন্দর্যলোকে

উত্তরণ যেন তাঁর প্রেম, নারী, প্রকৃতি ও সৌন্দর্যভাবনার এক সমগ্রসন্ধি রচনা করে চলে অবিরল। পূর্ববর্তী স্তবকে বর্ণিত ঐ নারীর অপরূপ রূপরাশি দর্শনে কবির মধ্যে যে আকর্ষণ জন্ম নেয় তার পরবর্তী স্তবকে দেখা যায়,

যখন তোমার ঠোঁট
স্পর্শ করে আমার ওষ্ঠ,
তখন জন্ম হয় কতিপয় নতুন নক্ষত্রের। তখন
তোমার পায়ে গুচ্ছ গুচ্ছ গোলাপ এবং আমার
কবিতার পংক্তিমালা, বঙ্গোপসাগরের ঢেউ।

লক্ষণীয় যে, নারীর দেহশোভা থেকে জাত মিলনাকাঙ্ক্ষা মদিরতা ছড়ালেও তা দেহের গণ্ডিতেই আবদ্ধ থাকছে না এবং স্থূল দেহসম্ভোগেই নিঃশেষ হচ্ছে না, সেখানে জন্ম নেয় নক্ষত্রমালা, গুচ্ছ গুচ্ছ গোলাপের সৌরভ, কবিতার পঙ্‌ক্তি, সাগরের ঢেউ।

আবার যখন তাঁরা চুম্বন থেকে বিচ্ছিন্ন হন তখন তিনি দেখেন,

ব্যানারের বাণীর মতো
আমার নাম জ্বলজ্বল করছে
তোমার চুলে, চোখে, ঠোঁটে, সূর্যোদয়-রাঙা বুকের টিলায়,
হাতে, কোমরে, উরুতে, নিতম্বে,
পায়ের দশটি নখে।

উদ্ধৃতাংশে দয়িতাদেহে তাঁর ভালোবাসার স্মারকের সঙ্গে ব্যানারের বাণীর ঔজ্জ্বল্যের তুলনা ভাববিভোরতা থেকে আকস্মিক টানে বাস্তবের সংগ্রামী প্রহরে নিক্ষেপ করে পাঠককে। অন্ত্যে কবিতাটি পুনরায় চলে যায় মঙ্গলময় সৌন্দর্যলোকে। প্রকৃতপক্ষে শামসুর রাহমান নারী-পুরুষের জৈবিক কামনাকে কবিতায় স্বীকার করে নেন এবং তিনি এ-ও জানেন যে, অনাদিকাল থেকে মানব-মানবী তাদের রক্তধারায় বয়ে চলেছে এই আদিম আকর্ষণ। কিন্তু নিতান্ত দেহলোলুপতা কিংবা বিবমিষা জাগানোর পরিবর্তে দেহজ কামনা বরাবরই তাঁর কবিতায় এক প্রশান্ত সুন্দরের প্রলেপ বুলিয়ে দেয়। ভালোবাসার পবিত্র ছোঁয়ায় তাঁর শরীর থেকে বয়সের পুরু ধুলো ধুয়ে যায়, প্রিয়ার শরীর ছুঁয়ে মনে হয় যেন কোনো অলৌকিক জলজ উদ্ভিদের সুগন্ধ উৎসারিত হচ্ছে। অর্থাৎ প্রবৃত্তির মলিনতা যে প্রেমকে দীন করে, সেই প্রেম ও সৌন্দর্য তাঁর কাম্য নয়; যে প্রেমের সঙ্গে রয়েছে সুন্দর ও মঙ্গলের সম্পর্ক তাকেই তিনি আরাধ্য করে তোলেন।

শামসুর রাহমানের প্রেমভাবনার অপর একটি প্রান্ত উন্মোচিত হয়েছে 'নীরবতা' শীর্ষক কবিতাটিতে। লক্ষণীয় যে, কবি প্রৌঢ়ত্বে এবং বার্ধক্যে পৌঁছে অজস্র প্রেমের কবিতা রচনা করেছেন, কবিতায় দয়িতাদেহকে করেছেন অনাবৃত এবং প্রায়শই বয়সে তারা কবির চেয়ে অনেক তরুণ। বয়সের এই ব্যবধান তাঁর মধ্যে প্রায়ই সংকচের দেয়াল তুললেও সেটি স্থায়ী হয় না, কেননা তিনি মনে করেন দেহের যৌবসাজ খসে গেলেও হৃদয়ের ঐশ্বর্যে তিনি আশ্চর্য যুবরাজ। তন্বী প্রিয়াকে ভালোবাসবার মতো অঢেল আবেগ তাঁর মনের মণিকোঠায় সঞ্চিত রয়েছে। এছাড়া অন্য যে কারণটি এই প্রেমের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে তাঁর মধ্যে কাজ

করে সেটি হচ্ছে জরাকে অতিক্রম করার এক দুর্মর আকাঙ্ক্ষা, যার আরেক নাম প্রবল জীবনতৃষ্ণা। আলোচ্য কবিতা থেকেই উদ্ধৃত করা যাক—

আমাদের কথোপকথনের ফাঁকে
যখন আমার অধীর চুম্বনে
ওর দম বন্ধ হয়ে আসে, তখন সে নিজেকে
এক ঝটকায় আলিঙ্গন থেকে সরে দাঁড়িয়ে
বলে পাগল না কি? পিছন থেকে
জড়িয়ে ধরে বলি, তোমাকে ছাড়া সুস্থ থাকার ইচ্ছে নেই।
এজন্যেই জরা আর ক্ষয়ের কামড়
বেমালুম ভুলে যৌবনের আঁচল
নিয়ে খেলতে খেলতে
হাসতে গিয়ে কাঁদি, কাঁদার সময় হেসে ফেলি।

তরুণীর দৃষ্টি তাঁর বুকে বহু শতাব্দীর মায়া ভরে দেয়, তার যে হাসি কবি উপহার হিসেবে পান তা তাঁকে

... মতিচ্ছন্নতায়
খানিক ডুবিয়ে মৃত্যুর কব্জা থেকে
দূরে সরাসরি স্বপ্নময় যৌবনে সাজিয়ে হাত ধরে
বেড়াতে নিয়ে যায়
সমুদ্র তীরে।

শামসুর রাহমানের কবিতায় তাঁর প্রেমভাবনা যেভাবে প্রতিফলিত হয়েছে তাতে যে দিকগুলো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, তার কিছু কিছু ইঙ্গিত আলোচনার শুরুতেই করা হয়েছে। প্রেম সম্পর্কে কবি যথার্থই বয়সকে কোনো প্রতিবন্ধক মনে করেন নি, প্রেমের মধ্যে হৃদয়াবেগের সঙ্গে শরীরের ভূমিকাও তিনি স্বীকার করেছেন। নারী-পুরুষের মধ্যেকার বিবাহপূর্ব প্রেমসম্পর্ক যেমন তিনি দেখিয়েছেন, তেমনি বিবাহবহির্ভূত প্রণয়ও তাঁর কবিতায় বহুলভাবে এসেছে। এক্ষেত্রে সমাজ-সংস্কারকে তিনি অতিক্রম করে গেছেন শিল্পীসুলভ জীবনাবেগে। তাঁর কবিতা থেকে বোঝা যায় যে, তিনি একাধিক নারীর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে, তবে তাই বলে নিজেকে তিনি 'ক্যাসানোভা' বলে মানতে নারাজ। বরং তাঁর জীবনে যে মধুরতমাদের আবির্ভাব ঘটেছিল, প্রত্যেকের প্রতিই ছিল তাঁর অনিঃশেষ হৃদয়াবেগ, প্রত্যেকেরই ছিল স্বতন্ত্র মূল্য এবং কাউকেই তিনি অসম্মান করেন নি। আক্ষরিক অর্থে তিনি নিঃসঙ্গ ছিলেন না, কিন্তু সবার মধ্যে থেকেও তিনি যে কতটা নিঃসঙ্গ সেই বিষয়টি বহুবার তাঁর কবিতায় এসেছে। প্রকৃতপক্ষে এ-হচ্ছে আধুনিক মানুষের আন্তর-নৈঃসঙ্গ্য। শামসুর রাহমানের জীবনে একাধিক নারীর আগমন, বিশেষ করে প্রৌঢ়ত্ব ও বার্ধক্যের একাকিত্বে নারী-সান্নিধ্যলাভের যে ব্যাকুলতা তাঁর মধ্যে দেখা যায়, সেখানে অন্তর্গত নৈঃসঙ্গ্য একটি কারণ হতে পারে, তবে এর পেছনে যে প্রবল জীবন-পিপাসা কাজ করেছে সে-বিষয়টি সন্দেহাতীত। যৌবনের তাপে প্রৌঢ়ত্ব ও বার্ধক্যকে সেঁকে নেয়ার

মানসেই তিনি নবীনার সঙ্গে বয়সের বিশাল অসমতা জেনেও প্রণয়ে মেতে উঠেছেন— অন্তত কবিতায়, যৌবনের ওষ্ঠ থেকে পান করেছেন প্রাণের অমৃতসুধা, জরাকে তাঁর চৌকাঠ মাড়াতে দেন নি। জীবন ও প্রেম সম্পর্কে কবির এই ধারণার একটি চমৎকার বিশ্লেষণ আমরা পাই তাঁরই লিখিত একটি প্রবন্ধে, যা এখানে উল্লেখ করলে বিষয়টি আরো স্পষ্ট হয়ে উঠবে। জগদ্বিখ্যাত চিত্রশিল্পী স্পেনের পাবলো পিকাসো (১৮৮১-১৯৭৩) সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে এক জায়গায় শামসুর রাহমান বলেছেন —

> জরা পিকাসোকে পরাস্ত করতে পারে নি, যেমন পারে নি গ্যেটেকে, ইয়েটসকে, রবীন্দ্রনাথকে। এঁরা প্রত্যেকেই ছিলেন দীর্ঘজীবী। ... শুধু দীর্ঘকাল তাঁরা বেঁচেছিলেন তা-ই নয়, জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত তাঁরা ছিলেন সৃষ্টিশীল। তাঁদের দেহে জরা আঁচড় কাটলেও তাঁরা যে শিল্পকর্ম রচনা করে গেছেন আজীবন তাতে যৌবনের রাজটীকাই জ্বলজ্বল করেছে সর্বক্ষণ। (শামসুর, ১৯৮৬ : ৭৬)

তারপরেই তিনি উল্লেখ করেছেন প্রতিভার পক্ষে শরীরের মজবুত বাঁধুনির গুরুত্ব বিষয়ে গ্যেটের বিশ্বাসের প্রসঙ্গটি। এনেছেন ইয়েটস যে নিজেকে একজন প্যাসনেট বৃদ্ধ মনে করতেন সেই বিষয়টি। বৃদ্ধ বয়সে নিত্য নতুন প্রেমিকা নিয়ে তিনি লিখেছেন আশ্চর্য সব প্রেমের কবিতা। বাঙালির অহংকার রবীন্দ্রনাথ ও ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোর সম্পর্কের কথাও উল্লেখ করেছেন কবি। তাছাড়া রবীন্দ্রনাথ যে মনের যৌবনে বিশ্বাস করতেন এবং তাঁর লেখা *মহুয়া* ও *পূরবী* কাব্যগ্রন্থের প্রেমের কবিতাগুলোও যে কবির পরিণত বয়সেই লেখা, সেই বিষয়টিও উল্লেখ করেছেন। এঁদের সম্পর্কে আর যে বিষয়টি তাঁর দৃষ্টিতে সদৃশ মনে হয়েছে সেটি হচ্ছে কম বেশি এঁরা সবাই ছিলেন বহুবল্লভ। বিশেষ করে পিকাসো সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি লিখেছেন —

> তাঁর জীবন ছিলো প্রণয়িণীবহুল। জীবনানন্দে আকণ্ঠ নিমজ্জিত ছিলেন ব'লেই হয়তো তিনি রমণীদের প্রতি গভীর আকর্ষণ বোধ করতেন। কিংবা হয়তো নারী সান্নিধ্যে খুঁজতেন নিঃসঙ্গতা থেকে মুক্তি। ... তাঁর জীবনে একের পর এক নারী এসেছে অবলীলাক্রমে: ... ...যদি কেউ এই মহান শিল্পীকে ক্যাসানোভা ব'লে ঠোঁট বেঁকিয়ে অপ্রিয় মন্তব্য করতে প্রলুব্ধ হন তবে নিঃসন্দেহে ভুল করবেন। সাধারণ ভোগবাদীদের পংক্তিতে কস্মিনকালেও তাঁকে দাঁড় করানো চলে না। শুধু ভোগস্পৃহা তাঁকে এত নারীর সান্নিধ্যে নিয়ে যায় নি; যেহেতু তিনি শিল্পী, তাই নারী-সৌন্দর্যের বৈচিত্র্যের প্রতি তাঁর আকর্ষণ ছিলো দুর্মর এবং এ-জন্যেই বিচিত্ররূপিণী মানবীদের দিকে বাড়িয়ে দিয়েছেন হৃদয়ের হাত। বস্তুত একজন সৃষ্টি-জাগর শিল্পীর অতৃপ্তিবোধই তাঁকে বহুবল্লভ করেছে। নারী দেহের প্রতি তিনি প্রবল মনোযোগী ছিলেন ঠিকই, কিন্তু কেবলমাত্র নর-নারীর মিলনেই তাঁর কৌতূহল সীমাবদ্ধ ছিলো না, তিনি তাঁর প্রতিটি অঙ্কশায়িনীর দেহকে অমর করে রেখেছেন শিল্পে। নারী সৌন্দর্যের প্রতি পিকাসোর আকর্ষণ ছিলো বহুমাত্রিক। পিকাসোর প্রণয়িণীগণ তাঁর জীবন ও চিত্রকলাকে প্রভাবান্বিত করেছেন কোনো না কোনোভাবে। ...রেনেসাঁসী মনীষীদের মতো পিকাসো সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়বোধকে জাগ্রত রেখেছিলেন আজীবন; এ-জন্যেই তাঁর সম্ভোগ কলুষমুক্ত এবং সত্তার বিকাশের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ। ... এক প্রগাঢ় জীবনানন্দে মেতে তিনি আমাদের সভ্যতাকে সমৃদ্ধ করে গেছেন। তাঁর এই জীবনানন্দের মূল প্রেরণা, বলতে লোভ হয়, সৃজনশীলতা এবং প্রেম, যা' জীবনেরই প্রবল ফাল্গুন। (শামসুর, ১৯৮৬ : ৭৯-৮১)

দীর্ঘ এই উদ্ধৃতির সূত্র ধরে বলা যায়, শামসুর রাহমানের জীবনানন্দের মূলীভূত প্রেরণাও ছিলো সৃজনশীলতা ও প্রেম। বাংলা কবিতার ইতিহাসে আমৃত্যু সৃজনশীল কবির তালিকায় তাঁর নামটি অগ্রগণ্য। নারীর সৌন্দর্য ও প্রেম তাঁকে আকৃষ্ট করেছে আজীবন। পিকাসো যেখানে রং-তুলিতে তাঁর নারীদের অমর করে রেখেছেন চিত্রমূর্তি গড়ে, শামসুর রাহমান সেখানে উপমা-উৎপ্রেক্ষা-রূপক-প্রতীকে গড়েছেন তাঁর প্রেমিকাদের শব্দ-মূর্তি। শুধু ভোগস্পৃহা তাঁকেও নারী-সান্নিধ্যে ব্যাকুল করে তোলে নি, বরং আমরা দেখেছি তাঁর কবিতা ও দয়িতার মধ্যে দূরত্ব খুবই সামান্য। অর্থাৎ প্রেম ও নারী সবসময়েই তাঁর কবিতায় বিশেষ প্রেরণা হয়ে কাজ করে গেছে এবং একজন সৃষ্টি-জাগর শিল্পীর অতৃপ্তিবোধ তাঁকেও করেছে বহুবল্লভ। নারীকে ঘিরে তাঁর সৌন্দর্য-চেতনা কলাপ মেলেছে নিরন্তর। শামসুর রাহমানের কবিতায় নারীর যে রূপ আমরা দেখি সেখানে একদিকে রয়েছে এলিয়টীয় নাগরিক অভিজাত নারী। তারা কখনো ডিভানে শায়িতা, কিংবা সোফায় আসীনা, রেস্তোরাঁয় স্যান্ডুইচ খায় ও কফিপানে অভ্যস্ত, নৈশপার্টিতে রুচিস্নিগ্ধ সাজে সজ্জিতা, প্রণয়ীর সঙ্গে শিল্প-সাহিত্যের নানা বিষয়ে বৈদগ্ধ্যপূর্ণ আলোচনায়ও সপ্রতিভ। তবে এই নারীকে তিনি স্থাপন করেছেন প্রকৃতির পটে। কোথাও দেখা যায় সেই নারী ঘাসরঙ কিংবা ঘাসফুল রঙের শাড়ি পরে আসে, কপালে থাকে মেরুন টিপ, পিঠময় ছড়ানো দীঘল কালো কেশরাশি, যেন নীপবনে বসে দুলে দুলে সদ্যলেখা কবিতা পাঠ করে, তার কণ্ঠে ঝরে জ্যোৎস্নাপ্লুত ঝরনার মৃদুধ্বনি, চোখে বনের নীলাঞ্জন, হ্রদের সৌন্দর্য কিংবা দিগন্তের ব্যাপকতা। কখনো সেই নারী জলকন্যা হয়ে নেমে যায় নীল সরোবরে, কখনো হয়ে যায় একরাশ সাদা জুঁইফুল। আবার কখনো জলের গভীর থেকে ভেসে ওঠে শরীরময় জলবিন্দু আর যৌবনের মদিরতা মেখে।

এসবের বাইরেও শামসুর রাহমান পশ্চিমা শিল্পসাহিত্য ও পুরাণের বেশকিছু নারীচরিত্র নিয়ে কবিতা রচনা করেছেন, যা থেকে তাঁর নারীভাবনার স্বতন্ত্র একটি দিক নির্ণয় করা যায়। এদের মধ্যে আফ্রোদিতি, ইলেকট্রা, কাসান্দ্রা, হেলেন, সালোমে, ওফেলিয়া এবং চিত্রকলাজাত গগ্যাঁর তাহিতির নারী, পিকাসোর ত্রিমুখী নারী, মাতিসের ওডেলিস্ক উল্লেখযোগ্য। গ্রিক পুরাণে প্রেম, সৌন্দর্য ও উর্বরতার দেবী আফ্রোদিতি। শামসুর রাহমান তাঁর অসংখ্য কবিতায় আফ্রোদিতির প্রসঙ্গ এনেছেন উপমায়, চিত্রকল্পে এবং আফ্রোদিতিকে নিয়ে কবিতাও লিখেছেন। এর পেছনেও সক্রিয় ছিল তাঁর বিশিষ্ট নারীভাবনা। তিনি নারীকে সৌন্দর্য, কল্যাণ, উর্বরতা, প্রেম ও কামনা ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যের আধাররূপে ভাবতেন। সে কারণে তাঁর কবিতায় যখন তখন আফ্রোদিতির আবির্ভাব ঘটে। ইলেকট্রা গ্রিক পুরাণের অপর একটি চরিত্র, যার কাহিনীর রূপকে শামসুর রাহমান 'ইলেকট্রার গান' (ইকারুসের আকাশ) শীর্ষক কবিতাটি লিখেছেন। ইলেকট্রা আর্গোসের রাজা আগামেমনন ও রানী ক্লাইটেমনেস্ট্রার কন্যা। মাতা ক্লাইটেমনেস্ট্রা ও তার দ্বিতীয় স্বামী অ্যাজিসথাস কর্তৃক নিহত পিতার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য সে দীর্ঘ অপেক্ষার কাল অতিবাহিত করে, কিছুতেই প্রিয় পিতাকে হত্যাকারী মা ও তার স্বামীকে সে ক্ষমা করতে পারে নি এবং শেষ পর্যন্ত ভ্রাতা অরেস্টেসকে দিয়ে মাতা ও অ্যাজিসথাসকে হত্যা করিয়ে সে প্রতিশোধ গ্রহণ করে। মনোবিজ্ঞানে 'ইলেকট্রা কমপ্লেক্স' ধারণাটি ইলেকট্রার নামানুসারেই করা হয়েছে।

শামসুর রাহমান তাঁর কবিতায় প্রতিশোধস্পৃহ নারীর চেয়ে শোককাতর অসহায় বিলাপরত এক নারী হিসেবেই তাকে দেখিয়েছেন। তাঁর কবিতাটি ভাইয়ের আগমন ও একটি সুন্দর আগামীর প্রত্যাশা ও প্রতীক্ষাতেই শেষ হয়েছে। গ্রিক পুরাণের অপর এক চরিত্র হেলেন, যার রূপের খ্যাতি খ্রিস্টপূর্বকাল থেকেই চলে আসছে, যার কারণে ট্রয় নগরী ধ্বংস হয় এবং দীর্ঘ দশ বছরের যুদ্ধে গ্রিক ও ট্রোজান উভয় জাতিরই বহু বীর প্রাণ হারায়। শামসুর রাহমান সেই হেলেনের প্রসঙ্গ নিয়ে কবিতা লিখেছেন —

ধরো যদি কাসান্দ্রার মতো কেউ বলত আমাকে
দারুণ অমোঘ তার কণ্ঠস্বরে, দেয়ালের লেখা
করো পাঠ ; হেলেনের মতো রূপ যার, তার দেখা
যদি পাও অকস্মাৎ অবেলায় দৈব দুর্বিপাকে,
কখনো দিও না সাড়া কুহক ছড়ানো তার ডাকে,
....
আমার শিরায় আজ ভাসছে সহস্র রণতরী,
মাংসের প্রাকারে হুহু আর্তনাদ, পুড়ছে মিনার
শতাব্দী শতাব্দী ধ'রে দুঃস্বপ্নের মতো, নিরুপায়।
তোমার নিকট থেকে আমাকে ফিরিয়ে দেবে, হায়,
ত্রিলোকে এমন সাধ্য নেই কোনো রূঢ় কাসান্দ্রার।
স্বপ্নের স্মৃতির মতো চোখে তাই চোখ মেলে ধরি।
('যদি কাসান্দ্রার মতো কেউ', *মাতাল ঋত্বিক*)

দেখা যাচ্ছে যে, শামসুর রাহমান শত বাধা, নিষেধ ও সর্বনাশের পূর্বাভাস পাওয়া সত্ত্বেও হেলেনের মতো সৌন্দর্যের অধিকারী কোনো নারী তাঁর জীবনে এলে তিনিও সব বাধা তুচ্ছ করে তার কাছেই যাবেন বলে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

গ্রিক পুরাণের এসব নারী ছাড়াও বাইবেলীয় পুরাণের চরিত্র সালোমের প্রসঙ্গও তাঁর একাধিক কবিতায় এসেছে। সালোমে পশ্চিমা শিল্পসাহিত্যে dangerous female seductiveness-এর প্রতীক হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। সালোমের লালসার শিকার হয়ে সন্ন্যাসী জন হারায় তাঁর শির এবং এভাবে সে আপন নিষ্ঠুর মনোবৃত্তি চরিতার্থ করে। শামসুর রাহমান পশ্চিমা শিল্পজগতের বহুলচর্চিত এই নারীমূর্তিকেও তাঁর নারীভাবনার অংশ করে নেন, যেখানে নারীর ভয়ংকর মূর্তিটি আমরা প্রত্যক্ষ করি। জীবনানন্দ দাশ তাঁর 'ক্যাম্পে' কবিতায় ঘাই হরিণীর প্রতীকে নারীর বিপজ্জনক অশুভ মূর্তিটি ধরতে চেয়েছেন, শামসুর রাহমান সেখানে বাইবেলীয় মিথকে এনেছেন।

শেক্সপীয়র-এর বিখ্যাত নাটক *হ্যামলেট*-এর নায়িকা ওফেলিয়াকে নিয়েও পশ্চিমা বিশ্বে অসংখ্য আলোচনা, সমালোচনা, চিত্রকর্ম গড়ে উঠেছে। ওফেলিয়ার জন্ম, বেড়ে ওঠা, তার প্রেম, উন্মাদনা ও জলে নিমগ্ন হয়ে মৃত্যু,– ইত্যাদি দিকগুলি সমালোচকদের নানামুখী বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত রেখেছে। শামসুর রাহমানও শেক্সপীয়রের এই আলোচিত চরিত্রটি নিয়ে কবিতা লিখেছেন। তাঁর কবিতায় নাটকের পুরো ঘটনার একটি ইঙ্গিত রয়েছে যা ওফেলিয়ার উক্তিতে উঠে এসেছে। মাতৃহীন অষ্টাদশী কুমারী ওফেলিয়া পিতা ও ভ্রাতার

স্নেহে, অভিভাবকত্বে ও নির্ভরতায় বড় হয়ে ওঠে। ভালোবাসার পাত্র হ্যামলেটের কাছ থেকে যে অপ্রত্যাশিত প্রত্যাখ্যান নেমে আসে এবং পরে ভুলবশত হ্যামলেটের হাতে পলোনিয়াসের হত্যা হ্যামলেটের জীবনে যে বিপর্যয় নিয়ে আসে, তার ফলে পিতা, ভ্রাতা ও প্রেমিক—একযোগে তার নির্ভরতার জায়গাগুলো হারিয়ে ওফেলিয়া মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে। পরিশেষে জলে নিমজ্জিত হয়ে তার মৃত্যু হয়। মূলত শামসুর রাহমানের লেখায় ওফেলিয়ার অসহায়ত্বের দিকটিই প্রাধান্য পেয়েছে। পুরুষনিয়ন্ত্রিত সমাজ নারীর স্বাধীনবিকাশের পথে কতবড় অন্তরায় সৃষ্টি করে এবং পুরুষের অভিভাবকত্ব কোনো কারণে অন্তর্হিত হলে সে নারীর জীবন কতটা অর্থহীন হয়ে পড়ে তারই একটি বড় উদাহরণ ওফেলিয়া চরিত্রটি। নিম্নে পুরো সনেটটিই উদ্ধৃত হল —

শরীরে আমার শারদজ্যোৎস্না বুনেছে কী মায়া
ভরা-আঠারোয়। শরীর আমার বসন্ত রাগ,
এখনো সজীব হৃদয়ের ফুলে কোনো কালো নাগ
দেয়নি ছড়িয়ে কৃষ্ণ জহর। তবে কিছু ছায়া,
অশুভই বটে, চেনা মানুষের ছন্দিত কায়া
ধ'রে ঘোরে এই আঁধার দুর্গে? রক্তের দাগ
দুর্গ-প্রাকারে বেঁধেছে জমাট। তুমিও বেহাগ
গাইছ কুমার, আমি নিরুপায় অসিদ্ধ জায়া!

কোথায় উধাও মেঘ-টলোটলো স্নিগ্ধ শ্রাবণ?
উটের পিঠের মতন দূরের মেঘতরঙ্গে
বাজে না তো আর জলতরঙ্গ। বলো, এ কেমন
ব্যাভার তোমার? ভুল হত্যার দূর নিশিডাক
তোমাকে ঘোরায় পথে-প্রান্তরে; স্বপ্নভঙ্গে
দেখি উড়ে আসে জলজ কবরে দোয়েলের ঝাঁক।
('ওফেলিয়ার গান', *মাতাল ঋত্বিক*)

ইউরোপের কোনো কোনো চিত্রশিল্পীর নারীভাবনা দ্বারাও শামসুর রাহমান ক্ষেত্রবিশেষে প্রভাবিত ছিলেন। এঁদের মধ্যে বতিচেল্লি (১৪৪৫-১৫১০), পিকাসো, মাতিস (১৮৬৯-১৯৫৪), গগ্যাঁ (১৮৪৮-১৯০৩), রুবেন্স (১৫৭৭-১৬৪০) প্রমুখের নাম উল্লেখ করা যায়। বতিচেল্লির অঙ্কিত নারীচিত্রের মধ্যে প্রেম, সৌন্দর্য ও উর্বরতার দেবী 'ভেনাসের জন্ম' চিত্রটি অন্যতম। ছবিটিতে সমুদ্রের ফেনা থেকে জন্ম নেয়া সৌন্দর্যের দেবী ভেনাস নগ্নদেহে ঝিনুকের খোলে ভেসে তীরে এসে নামছে, তার গায়ে তখনও ফেনা লেগে রয়েছে এবং আকাশ থেকে পুষ্পবৃষ্টি হচ্ছে, দেব-দেবীরা তাকে আকাশ থেকে স্বাগত জানাচ্ছে — সব মিলিয়ে পৃথিবীতে সৌন্দর্যের প্রথম আগমনকে বরণ করার একটা আয়োজন দেখা যায়। শামসুর রাহমানের কবিতায় এই সৌন্দর্যময়ীর বন্দনা থেকে তাঁর নারীভাবনার বিশেষত্বটি চোখে পড়ে। অর্থাৎ, তিনিও নারীকে সৌন্দর্য ও কল্যাণের আধার মনে করেন। রুবেন্স-এর অঙ্কিত চিত্রের নারী স্বাস্থ্যোজ্জ্বল, কমনীয়, আনন্দপূর্ণ। শামসুর রাহমানও নারীকে দেখেন

আনন্দময় ও সুস্থ জীবনের প্রেরণারূপে। তাঁর কবিতায় বিভিন্ন স্থানে পিকাসোর ঘোড়ামুখী নারী, ত্রিমুখী নারী ইত্যাদির উল্লেখ দেখা যায়। সেখানে তিনি পিকাসোর নারীভাবনা দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়েছেন। পিকাসো একজন প্রবল জীবনবাদী শিল্পী এবং প্রেমিক পুরুষ ছিলেন। তাঁর সমস্ত জীবনে এমনকি শেষপর্যন্তও ছিল অসংখ্য প্রেমিকা। কিন্তু তিনি কখনো তাদের ভোগের সামগ্রী হিসেবে দেখেন নি। বরং তাদের প্রতি ছিল তাঁর অপরিসীম প্রেম ও শ্রদ্ধা। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁর প্রেমিকারাই ছিল তাঁর মডেল। তাদের প্রতি শ্রদ্ধাবশত তাদের চেহারা প্রকাশ না করে একই সঙ্গে তাঁর উদ্ভাবিত কিউবিজম ও আফ্রিকান আর্টের টেকনিক প্রয়োগে তিনি তাঁর অঙ্কিত নারীদের মুখে নানা মুখোশ এঁটে দিতেন, কিংবা বিকৃত করে দিতেন, অথবা একেবারেই চেহারা বিলোপ করে দিতেন। শামসুর রাহমানও তাঁর জীবনে আসা প্রেমিকাদের পরিচয় গোপন রেখেছেন এবং একই সঙ্গে তাদের সান্নিধ্যে ও প্রেমে তিনি যে অপরিমেয় আনন্দ ও জীবনের উত্তাপ পেতেন সেসব অনুভূতি তাঁর প্রেমের কবিতাসমূহের পঙ্‌ক্তিপরম্পরায় বিধৃত করে রেখেছেন। মাতিসও নারীকে উর্বরতা, প্রেম, কামনা ও আনন্দময় জীবনের উৎস মনে করতেন। তাঁর আঁকা ছবিতে তাই দেখা যায় নৃত্যরত নারী, সুন্দর দেহলতা, বর্ণবহুল ক্যানভাস ইত্যাদি। শামসুর রাহমান মাতিসের অঙ্কিত নারীর কথা তাঁর কবিতায় নানা উল্লেখে নিয়ে এসেছেন এবং মাতিস অঙ্কিত 'ওডেলিস্ক' সিরিজের ওডেলিস্ক-কে নিয়ে কবিতা লিখেছেন। উনিশ শতকে ইউরোপে 'প্রিমিটিভিজম' চিত্রকলা ও ভাস্কর্যশিল্পে এক আন্দোলনরূপে আবির্ভূত হয়। গগ্যাঁ সেই আদিম সৌন্দর্যের সন্ধানে তাহিতি গমন করেন এবং সেখানে আদিবাসী তাহিতি নারীর সঙ্গে দীর্ঘদিন বসবাস করেন। তিনি তাদের আদিম বিশ্বাস-সংস্কার, সারল্য ও স্বভাবসৌন্দর্য তাঁর ক্যানভাসে অমর করে রেখেছেন। পশ্চিমে বহুকাল ধরে চিত্রশিল্পীরা নিজেদের স্টুডিওতে মডেলদের এনে তাদের নগ্নচিত্র আঁকতেন। সেখানে মডেলরা থাকত সচেতন এবং সে ভঙ্গিমা তাদের ছবির মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেত, তাদের দেহ সুন্দর এবং তা পটে ধরে রাখা হচ্ছে, তাদের দৃষ্টিতে এটি ছিল স্বতঃপ্রকাশ। কিন্তু গগ্যাঁ তাহিতির নারীদের যেসব ছবি এঁকেছেন তাতে ঐ মডেলদের মৌখিক অভিব্যক্তি থেকে বোঝা যেত যে তারা তাদের দেহবিষয়ে সচেতন নয়। নগ্নতা তাদের কাছে স্বাভাবিক ঘটনা। আদিম প্রকৃতির মতই তারা স্বভাবসুন্দর। শামসুর রাহমান নারীর এই সহজসুন্দর মূর্তিকেও তাঁর কাব্যবিশ্বাসের অঙ্গীভূত করে নিয়েছেন। নিচে কয়েকটি উদাহরণ তুলে দেয়া হল —

১। তার
স্বপ্নের জমিনে ভ্যানগঘি সাইপ্রেস
কখনো ফেলে না ছায়া কিংবা তাহিতির
অজর রমণী কোনো ফলময় থালা হাতে দাঁড়ায় না এসে
ক্ষণকাল। ('রাত্রির তৃতীয় যামে', *উদ্ভট উটের পিঠে চলেছে স্বদেশ*)

২। কোনো খেদ নেই
স্বতই জীবনোজ্জ্বল রুবেন্স-রমণী প্রায় কমনীয় ত্বকময়ী দয়িতা
আমাকে
একদিন ত্যাগ ক'রে যাবে ভেবে।
('কোনো ইন্দ্রনীল অভিমান নেই', *প্রতিদিন ঘরহীন ঘরে*)

৩। বতিচেলি নারী নয়, মাতিসের রমণীর মতো
তেমন কাউকে নয়, যে-হোক সে-হোক নারীকেই
পাশে নিয়ে রাস্তায় হাঁটব ভেবে সুখে অবিরত
হঠাৎ নিজেরই পায়ে মেরেছি কুড়াল। ('আত্মজৈবনিক', *বিধ্বস্ত নীলিমা)*

৪। অপরাহ্নে ডিভানে শায়িতা
মহিলা আমাকে ডেকে পিকাসোর ত্রিমুখী রমণী হয়ে যান
চোখের পলকে আমি তার স্তনদ্বয়, অভিজাত নাভিমূল,
রমণীয়, উল্লসিত যোনি থেকে দূরে, ক্রমশ অনেক দূরে
চলে যেতে থাকি; তিনি কবিতার পঙ্‌ক্তির মতন
কেবলই ওঠেন বেজে অস্তিত্বে আমার। ('টানলে একাকী', *কবিতার সঙ্গে গেরস্থালি)*

উল্লিখিত উদাহরণ চতুষ্টয়ের চতুর্থ উদাহরণের শেষ পঙ্‌ক্তির মধ্যেই শামসুর রাহমানের অস্তিত্বে তথা তাঁর কবিসত্তায় প্রেম এবং নারীর যে অবিচ্ছেদ্যতা সে বিষয়টি স্বতঃউৎসারিত। প্রেমের বিচিত্র অনুভবে মঞ্জরিত তাঁর কাব্যভুবন, যা তাঁর সৃষ্টির কেন্দ্রে মূলীভূত ছিল অনিঃশেষ শক্তি ও প্রেরণারূপে। নারীকে দেখেছেন তিনি সেই শক্তি ও প্রেরণার উৎসরূপে। নারীর সৌন্দর্য, তার কল্যাণী মূর্তি তাঁকে আজীবন মুগ্ধ আকর্ষণে করে রেখেছে সৃষ্টিজাগর। পারিপার্শ্বিক শত বাধা বিপত্তি, জীবনের নানা সংকট এমন কি দেহের জরাকে অতিক্রম করার দার্ঢ্যও তিনি অর্জন করেছেন নারীর প্রেমে মগ্ন হয়ে।

তথ্যসূত্র

১. হুমায়ুন আজাদ তাঁর *শামসুর রাহমান/নিঃসঙ্গ শেরপা* গ্রন্থে এ-বিষয়ে তাঁর বিশ্লেষণ তুলে ধরেছেন এভাবে ' ব্যতিক্রমী নয়, প্রথাসম্মত রাস্তাই শামসুর রাহমানের রাস্তা।' পৃ.১৩৮

২. শামসুর রাহমান, উৎসর্গপত্র, *বিধ্বস্ত নীলিমা, কবিতাসমগ্র ১*, পৃ ১৬১

৩. জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী-র একটি লেখায় এই কবিতার জন্ম-ইতিহাস জানা যায়। তিনি লিখেছেন,"..শামসুর রাহমানের বাড়িতে যখন আমরা মিলিত হতাম সেটা বিশেষভাবে উপভোগ্য মনে হতো আমাদের জন্য। এমনি এক আড্ডায় রশীদ করীম দাবি করে বসলেন, কবিকে একটি কবিতা রচনা করতে হবে, যার বিষয় হবে, স্ত্রীর দৃষ্টিতে তিনি কেমন। এর পরের বৈঠকে, অকুস্থল একই, কবির পুরনো ঢাকার বাড়ি — আমরা শুনলাম কবিকণ্ঠে তার সেই কবিতা, 'তাঁর চোখে আমি'। (জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী (২০১০), পরিচয়ের পঞ্চাশ বৎসর : *শামসুর রাহমান স্মারকগ্রন্থ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃ.৩-৪)

গ্রন্থপঞ্জি

অমলেন্দু বসু (২০০৮)। 'বাঙলায় প্রেমের কাব্য', *প্রবন্ধ সংগ্রহ* প্রথম খণ্ড, কলকাতা।

খোন্দকার আশরাফ হোসেন (২০০২)। 'পুষ্প-কিম্বদন্তীসমূহ', *চিরায়ত পুরাণ*, ফ্রেন্ডস্ বুক কর্ণার, ঢাকা।

বায়তুল্লাহ্ কাদেরী (২০০৯)। *বাংলাদেশের ষাটের দশকের কবিতা বিষয় ও প্রকরণ*, নবযুগ প্রকাশনী, ঢাকা।

বুদ্ধদেব বসু (২০০৮)। প্রেমিক : *বন্দীর বন্দনা, কবিতাসংগ্রহ ১*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

মাসুদুজ্জামান (১৯৯৩)। *বাংলাদেশ ও পশ্চিম বাংলার কবিতা : তুলনামূলক ধারা*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

রশীদ করীম (২০০৩)। 'শামসুর রাহমানের কবিতা', *প্রবন্ধ-সমগ্র*, সাহিত্যপ্রকাশ, ঢাকা।

শামসুর রাহমান (২০০৫)। *কবিতাসমগ্র* ১, অনন্যা, ঢাকা।
শামসুর রাহমান (২০০৬)। *কবিতাসমগ্র* ২, অনন্যা, ঢাকা।
শামসুর রাহমান (২০০৭)। *কবিতাসমগ্র* ৩, অনন্যা, ঢাকা।
শামসুর রাহমান (২০০৭ক)। *কবিতাসমগ্র* ৪,অনন্যা, ঢাকা।
শামসুর রাহমান (২০০৫)। *শামসুর রাহমান গদ্যসংগ্রহ,* গৌতম রায় [সম্পা.] পুনশ্চ, কলকাতা।
শামসুর রাহমান (১৯৮৬)। *আমৃত্যু তাঁর জীবনানন্দ,* বইঘর, চট্টগ্রাম।
হুমায়ুন আজাদ (২০০৪)। *শামসুর রাহমান/নিঃসঙ্গ* শেরপা, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা।

প্রবন্ধপঞ্জি

শহীদ কাদরী (২০০৬)। শামসুর রাহমান : শিল্পে শহীদ। 'কালি ও কলম' (মাসিক পত্রিকা) শামসুর রাহমান স্মরণ সংখ্যা। আবুল হাসনাত [সম্পা], পৃ. ৬৮

সিকদার আমিনুল হক (২০১০)। 'শামসুর রাহমানের কবিতা', *শামসুর রাহমান স্মারকগ্রন্থ।* শামসুজ্জামান খান ও আমিনুর রহমান সুলতান [সম্পা.], বাংলা একাডেমী, পৃ. ৭৩

শামসুর রাহমানের মুখোমুখি (১৯৯১)। 'মীজানুর রহমানের ত্রৈমাসিক পত্রিকা', শামসুর রাহমান সংখ্যা, ঢাকা, পৃ. ১২৭

আনিসুজ্জামান কর্তৃক গৃহীত সাক্ষাৎকার (২০০৬), ভালোবাসা ছাড়া মানুষ থাকতে পারে না, *শামসুর রাহমান জীবনমঙ্গলের কবি,* মোহাম্মদ শাহজাহান [সম্পা.], ঢাকা, পৃ. ১৯৮